নবজীবনের প্রাতে

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ
—আড়াই টাকা-

প্রথম মুদ্রণ ঃ
আষাঢ়, ১৩৫১

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীশশধর চক্রবর্তী কর্তৃক ২৫, ডি, এল্ রায় ষ্ট্রীটস্থ
কালিকা প্রেস লিঃ হইতে মুদ্রিত

নব-জীবনের প্রাতে যাঁহারা অর্ঘ্য সাজাইয়াছেন-

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গায়ে হলুদ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাণুর বিবাহ

প্রবোধকুমার সান্যাল

গন্ধ কবিতা

মনোজ বসু

রাত্রির রোমান্স

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রত্যহের স্পর্শ

সুমথনাথ ঘোষ

উপহার

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

প্রিয়তমের চিঠি

বনফুল

তিলোত্তমা

বিবাহ ও নববিবাহিত জীবনের উপর বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিকদের লেখা কয়েকটি গল্পের একখানি সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ করিবার তাগিদ পাইতেছি বহুদিন হইতেই। এতদিনে শুভানুধ্যায়ী ও সাহিত্যরসিক বন্ধুদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সক্ষম হইলাম। স্থানাভাবের জন্য কয়েকটি বিশিষ্ট লেখকের দ্বারস্থ হইতে পারি নাই। সে ত্রুটি মার্জ্জনীয়। লেখাগুলি যেমন ভাবে হস্তগত হইয়াছে তেমনিই সাজাইয়াছি—লেখকের মর্য্যাদা বিচার করিয়া সাজানো হয় নাই, সে ক্ষমতাও আমাদের নাই।

গায়ে হলুদ

শ্রাবণ মাসের দিন, বর্ষার বিরাম নেই, এই বৃষ্টি আসছে এই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্চে। ক্ষেতে আউস ধানের গোছা কালো হয়ে উঠেচে, ধানের শিষ দেখা দিয়েচে অধিকাংশ ক্ষেতে।

পুঁটি সকালে উঠে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে—চারিদিক মেঘে মেঘাচ্ছন্ন। হয়তো বা একটু পরে টিপ-টিপ বিষ্টি পড়তে শুরু ক'রে দেবে। আজ তার মনে একটা অদ্ভুত ধরণের অনুভূতি, সেটাকে আনন্দও বলা যেতে পারে, ছদ্মবেশী বিষাদও বলা যায়। কি যে সেটা ঠিক ক'রে না যায় বোঝা, না যায় বোঝানো। আজ তার বিয়ের গায়ে-হলুদের দিন। এমন একটা দিন তার বারো বৎসরের ক্ষুদ্র জীবনে এইবার এই প্রথম এল। সকালে উঠতেই জেঠিমা বলেছে—ও পুঁটি জলে ভিজে ভিজে কোথাও যেন যাস্ নি ; আর তিনটে দিন কোনও রকমে ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে যে বাঁচি।

নব জীবনের প্রান্তে

আজ কি বার ?—মঙ্গলবার। শনিবার বুঝি বিয়ের দিন। পুঁটির মনে সত্যিই কেমন হয়, আনন্দের একটা ঢেউ যেন গলা পর্য্যন্ত উঠে আটকে গেল। বিয়ে বেশি দূরে কোথাও নয়, এই গ্রামেই, এমন কি এই পাড়াতেই। এক ঘর ব্রাহ্মণ আজ বছরখানেক হ'ল অন্য জায়গা থেকে উঠে এসেচেন এখানে, দু'খানা বড় বড় মেটে ঘর বেঁধেছেন—একখানা রান্নাঘর। এতদিন ধ'রে সে সঙ্গিনীদের সঙ্গে সেই বাড়ীতে কুল পাড়তে গিয়েচে, সত্যনারায়ণের সিন্নি আনতে গিয়েচে—যখন পাড়ার প্রান্তের ঘন জঙ্গল কেটে সে ভদ্রলোক বাড়ি তৈরি করেন ঘাটে যাবার পথের একেবারে ডান ধারে—তখন সে কতবার ভেবেচে এই ঘন বনের মধ্যে বাড়ী ক'রে বাস করবার কার না জানি মাথাব্যথা পড়ল।

কে জানত, সেই বাড়িটাই—আজ এক বছর এখনও পোরে নি—তার শ্বশুরবাড়ী হবে!

কতদূর আশ্চর্য্যের কথা, কতদূর বিস্ময়ের কথা, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অথচ তারই ক্ষুদ্র জীবনে এমন একটা মহাশ্চর্য্য ব্যাপার সম্ভব হল। যখনই সে এ কথাটা ভাবে, তখনই সে সুদ্ধ তার মন সুদ্ধ যেন কতদূরে কোথায় চলে যায়।

ঐ ভদ্রলোকের একটি মাত্র ছেলে, নাম সুবোধ, তারই সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েচে। সুবোধকে এই সম্বন্ধের আগে তাদের বাড়িতে কয়েকবার যাতায়াত করতে দেখেচে—বেশ ফর্সা, লম্বামত মুখ, এবার ম্যাট্রিক দিয়েচে, এখনও পরীক্ষার ফল বার হয় নি। আগে আগে, সত্যি কথা বলতে গেলে সুবোধের মুখ পুঁটি তত পছন্দ করতো না। তার দাদার সঙ্গে যতবার এসেছে তাদের বাড়িতে—পুঁটি ভাবতো—দেখো না,

ঘোড়ার মত মুখখানা। কিন্তু আজকাল আর সুবোধের মুখ ঘোড়ার মত ত' মনে হয়ই না, মনে হয় বেশ চমৎকার মুখ! গ্রামের মধ্যে অমন চোখ, অমন রং, অমন মুখের গড়ন কার আছে?

রায়েদের পাঁচি সেদিন বলেছিল তাকে—হাঁরে, তুই যে বড় ঘোড়ামুখো বলতিস্, তোর অদেষ্টে শেষকালে কিনা সেই ঘোড়ামুখোই জুটল!

পুঁটি মারতে ছুটে গিয়েছিল তার পিছু পিছু।

পুঁটির বাবা গোলার দোরে দাঁড়িয়ে ধান পাড়বার ব্যবস্থা করচে। তার বাবা বেশ চাষীবাসী গেরস্ত। পুঁটিদের বাড়িতে চারটে বড় বড় ধানের আউড়ি আছে, গোলা আছে একটা। আউড়ি জিনিষটা গোলার চেয়ে অনেক ছোটো তিন চার বিশ ধান ধরে—আর একটা গোলায় ধরে এক পৌটি অর্থাৎ ষোল বিশ ধান।

তাদেরও ধান আছে গোলা ভর্ত্তি, সব ক'টা আউড়ি ভর্ত্তি। কলকাতায় চাকুরী করেন এ পাড়ার হরিকাকা, তিনি মাঝে মাঝে গাঁয়ে এসে পুঁটির বাবাকে বলেন—আর কি রায় ম'শায়, এ বাজারে আপনি ত রাজা। গোলা ভর্ত্তি ধান রেখেছেন ঘরে, আপনার মহড়া নেয় কে? কলকাতায় 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে এক সের চাল নিতে হচ্চে—আর আপনি—।

পুঁটি জিজ্ঞেস করেছিল—কিসে দাঁড়িয়ে চাল নিতে হয় বাবা, বলছিল হরিকাকা?

—কে জানে কিসে দাঁড়িয়ে, তুই নিজের কাজ কর, আমি নিজের করি—মিটে গেল।

—তুমি জান না বুঝি ও কথাটার মানে? না বাবা?

নব জীবনের প্রাতে

—না জেনেও ত পায়ের ওপর পা দিয়ে এ বাজারে চালিয়ে দিলাম মা। কলকাতার মুখ না দেখেও ত বেশ চলে যাচ্চে।

কলকাতায় নাকি মানুষের এক সের চালের জন্যে চার ঘণ্টা কোথায় নাকি দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—কিন্তু যে বাড়িতে তার বিয়ে হচ্চে, তাদের অবস্থা এত ভালো নয়। সুবোধ যদি পাশ করে, তবে হরিকাকা ভরসা দিয়েচেন কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাকে ওঁর আফিসে চাকুরী ক'রে দেবেন। তা হ'লে তাকেও কি কলকাতায় গিয়ে বাসায় থাকতে হবে আর সেই কিসে দাঁড়িয়ে রোজ এক সের চাল নিয়ে এসে রাঁধতে হবে? সে যে বড় কষ্ট—তবে, মানে সুবোধ যদি সঙ্গে থাকে, সে বোধহয় সব রকম কষ্টই করতে প্রস্তুত আছে!

তাদের ধানের গোলা থেকে ধান পাড়া হচ্চে, খাব্‌রাপোতা থেকে সীতানাথ কলু আড়ৎদার এসেচে—ধান কিনে নিয়ে যাবে। বিয়ের খরচপত্র ধান বেচে করতে হবে কিনা।

ওর জেঠিমা বললেন—ও পুঁটি আজ কোথাও বেরিও না। নাপিত ও-বাড়ি থেকে হলুদ নিয়ে আসবে, সেই হলুদ গায়ে দিয়ে তোমায় নাইতে হবে।

এমন সময় সাধন জেলে এসে ভিজতে ভিজতে উঠোনে দাঁড়াল। হাত জোড় ক'রে মাথা নীচু করে প্রণাম করে বললে—প্রাতপেন্নাম।

তার বাবা বললে—ও সাধন, বাবা তোমায় ডেকেছি যে একবার। আমার যে কিছু মাছের দরকার এই শনিবারে।

কি জানি কেন, পুঁটির বুকটা দুলে উঠল। এই শনিবার—এই শনিবারে তা হলে সত্যিই তার—

নব জীবনের প্রান্তে

সাধন বললে—আজ্ঞে, মাছের যে বড্ড গোলমাল যাচ্চে। গাঙে কি মাছ আছে? ডুমোর বাঁওড়ের মাছ সব যাচ্চে কলকাতায়। বিরাশি টাকা দর। এমন দর বাপের জন্মে কোনও কালে শুনি নি রায় মশায়। এক সের দেড় সের পোনা ইস্তক পড়তে পাচ্চে না। মরাগাঙে বাঁধাল দিয়েলাম একদিন—কেবল এক সাড়ে এগার সের গজাড় মাছ—

পুঁটির বাবা বিস্ময়ের সুরে বললে—সাড়ে এগার সের গজাড়! এমন কথা ত কখনও শুনি নি—

—অরিবৎ গজাড় রায় মশায়। মাছের এমন দর, গজাড় মাছই বিক্রি হয়েল দশ আনা সের।

পুঁটি আর সেখানে দাঁড়াল না। মাকে এমন আজগুবি খবরটা দিতে ছুটল বাড়ির মধ্যে। বিষ্টি একটু থেমেচে, একটু কোথাও বেরুতে পারলে ভালো হ'ত। তার জীবনে যে এমন একটা আশ্চর্য্যি ব্যাপার হতে চলেচে এ কথাটা কারও সঙ্গে আনন্দ করে বলাও চলে না। বেহায়া বলবে, নিন্দে করবে। কেবল বলা চলে তার সমবয়সী পাঁচি, আর ক্ষেন্তি জেলেনীর মেয়ে টুনির কাছে। আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার—তার চেয়ে অন্তত সাত বছরের বড় লতি দিদির এখনও বিয়ে হয় নি—অথচ লতিদিকে সবাই বলে সুন্দরী, লতিদির বাপের অবস্থা ভালো। লতিদি লেখাপড়া জানে ভালো। গান করে, ওর বাবা যখন কলকাতায় চাকরী করত, তখন লতিদি স্কুলে পড়ত সেখানে। কত বই পড়ে বসে বসে দুপুর বেলা। পুঁটি ওদের বাড়ি যায় যখনই তখনই দেখে লতিদি বই মুখে বসে। পুঁটি ভাল লেখাপড়া জানে না, বইয়ের নাম পড়তে পারে না, লতিদি একটু ঠ্যাকারে, সে লেখাপড়া জানে না বলে বুঝি আর মানুষ

না? তাকে বলে—তুই বই-টই নাড়িস নে পুঁটি। কি বুঝিস্ তুই এর আস্বাদ?

পুঁটি হয়ত বলে—এ কি বই বল না লতিদি?

—যা যাঃ, আর বইয়ের খবরে দরকার নেই। শরৎ চাটুজ্যের নাম শুনেচিস্? কোথা থেকে শুনবি? তোরা শুধু জানিস্ ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কি করে চিঁড়ে কুটতে হয়। তাই করগে যা - এদিকে কেন আবার?

আচ্ছা, আজ তার লতিদিকে বলতে ইচ্ছে হচ্চে—কই লতিদি, তুমি এত বই পড়ে টড়ে বসে আছ, এত সব নাম জান—কই তোমার ত আজও বিয়ে হ'ল না। আমার জীবনে এত বড় একটা আশ্চর্য্যি কাণ্ডতো টুক্ করে ঘটে গেল। ধানের নিন্দে কর, বাবার গোলায় ধান ছিল বলে ত আজ—কই তোমাদের ত—তারপর ম্যাট্রিক পাশ বর। এ গাঁয়ে পাশ করা ছেলে একমাত্র আছে মুখুজ্যেদের জীবন দা'। সে নাকি দুটো পাশ—কোথায় চাকরী করচে যেন—ঐ দিকে কোথায়। যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্চে, সে মুখ্যু নয়। পাশের খবর বেরুবার দেরি নেই—বাবা বলেন, সুবোধ নিশ্চয়ই পাশ করবে। হে ভগবান, তাই করো, পাশ যেন সে করে, সত্যনারাণের সিন্নি দেবে সে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে।

নাপিত এসে বললে—মা ঠাকরুণ, ও-বাড়ি থেকে দেখে এলাম। গায়ে হলুদের লগ্ন বেলা দশটার পর। আপনাদের যা দিতে হবে তার আগে দিয়ে দেবেন।

নব জীবনের প্রান্তে

গায় হলুদের তত্ত্ব আসচে ওবাড়ি থেকে। কি রকম জিনিসপত্র না জানি আসে। পুঁটির মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। একখানা লাল কাপড় নিশ্চয়ই তারা দেবে। পুঁটির মোটে তিনখানা শাড়ি—আর একখানা ডুরে শাড়ি আছে মায়ের বাক্সে তোলা। এবার তার অনেক কাপড় হবে, গহনাও হবে। পাঁচ ভরি সোনা দেবার কথাবার্ত্তা হয়েচে। এতদিন দুটি দুল ছাড়া অন্য কোনও গহনা তার অঙ্গে ওঠে নি—অথচ ঐ কুমারী মেয়ে লতিদিরই হাতে ছ'গাছা করে চুড়ি, গলায় লকেট্ ঝোলানো হার, কানে পাশা, হাতে আংটিও আছে। ও থাকতো শহরে, সেখানে মেয়েদের চালচলন আলাদা। এ সব পাড়াগাঁয়ে কুমারী মেয়েরা কাঁচের চুড়ি ছাড়া আবার কি গহনা পরে? অত পয়সাও নেই তার বাপের। গোলায় দুটো ধান আছে মাত্র, নগদ পয়সা কোথায়। যা কিছু করতে হয়, সে ঐ ধান বেচে।

ভীষণ বৃষ্টি এসেচে। সঙ্গে সঙ্গে সামান্য ঝড়। রান্না ঘরের ছাঁচ-তলায় দাঁড়িয়ে বকনা বাছুরটা ভিজচে। কচুপাতায় জল জমে আবার গড়িয়ে গড়িয়ে পড়চে। তাদের কৃষাণ বীরু মুচি বলছে—ও দিদি ঠাকরোণ, তা একটু তামাক দ্যাও মোরে, বিয়ে বাড়ি যে মনেই হচ্চে না। দু'দশ ছিলিম তামাক পোড়বে তবে ত বোঝবো যে নগনশা লেগেচে।

পুঁটি বীরুকে ধমক দিয়ে বললে—যাঃ, তোর আর বক্তৃতা দিতে হবে না। তামাক আমি কোথায় পাবো? কাকীমার কাছে গিয়ে চাইগে যা—

একটু বেলা হয়েচে। বাড়ীতে অনেক লোক এসেছে বিয়ের জন্যে। বিয়ে বাড়ির মত দেখাচ্চে বটে—কুমোরপুরের কাকীমা, পাঁচঘরার

নব জীবনের প্রান্তে

মাসীমা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেচেন—আজ বেলা এগারোটার সময় আরও একদল আসবে, ইস্টিসানে গাড়ি গিয়েচে। মেয়েরা সবাই দল বেঁধে নদীতে নাইতে গেল। কুমোরপুরের কাকীমা যাবার সময়ে তাকে বলে গেল—বাঁড়ুজ্যে বাড়ি পিঁড়ি চিত্তির করতে দিয়ে আসা হয়েচে, দেখে আসিস্ পুঁটি সে-দুখানা পিড়ি হয়েছে কি-না—

কাকীমার এটা অন্যায় কথা। তার লজ্জা করে না? নিজের বিয়ের পিঁড়ি নিজে বুঝি সে চাইতে যাবে? এত বেহায়া সে এখনও হয় নি।

তার বাবা চণ্ডীমণ্ডপ থেকে হেঁকে বললেন—ও পুঁটি, হাতায় করে একটু আগুন নিয়ে এস মা—

চণ্ডীমণ্ডপের দোর পর্য্যন্ত গিয়ে ও শুনলে ওর বাবা আর একজন অজ্ঞাত লোকের মধ্যে নিম্নোক্ত কথাবার্ত্তা—

—তা হলে পাল্‌কির বন্দোবস্ত দেখতে হয়।

—আজ্ঞে পাল্‌কি কোথায় মিলবে? ষোলড়্‌বুরির কাহারপাড়া নির্ব্বংশ। পাল্‌কি বইবার মানুষ নেই এ দিগরে।

—তবে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এস বনগাঁ থেকে।

এ কাদা-জলে দশ টাকা দিলেও আসবে না। আসবার রাস্তা কই?

—ওরা বিদেশী লোক। বর আসবার ব্যবস্থা আমাদেরই করে দিতে হবে বুঝলে না? আমরাই পারচি নে, ওরা কোথায় কি পাবে? হিম হয়ে বসে থেকো না। যা হয় হিল্লে লাগিয়ে দ্যাও একটা।

—আচ্ছা বাবু, বলদের গাড়িতে বর আন্‌লি কেমন হয়?

নব জীবনের প্রান্তে

—আরে না না—সে বড় দেখতে খারাপ হবে! সে কি—না, না। শুন্‌চি ওরা ইংরিজি বাজনা আনচে। বলদের গাড়ির পেছনে ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে বর আসবে, তাতে লোক হাসবে।

—কেন বাবু তাতে কি? বলদের গাড়িতে কি আর বর যায় না? একেবারে আপনাদের বাড়ির পেছনে এসে থামবে—সেই ত ভালো।

—বলদের গাড়িতে বর যাবে না কেন? সে কি আর ভদ্দরলোকের বর যায়? তা ছাড়া পেছনের ওপথ আইবুড়ো পথ। ওখান দিয়ে বর আসবে না, সামনের তেঁতুল তলার রাস্তা দিয়ে বরকে আনতে হবে। তুমি আজই যাও দিকি ষষ্ঠীতলা। সেখানে ক'ঘর কাহার আছে শুনিচি। সেখান থেকেই পাল্‌কি আনাতে—

—সে যে এখান থেকে তিনকোশ সাড়ে তিনকোশ রাস্তা বাবু!

পুঁটি সেখানে আর দাঁড়ালো না! সুবোধ আসবে বর সেজে বলদের গাড়িতে? হি—হি—সে বড় মজা হবে এখন! ধুতরো ফুলের মালা গলায় দিয়ে?

দৃশ্যটা মনে কল্পনা করে নিয়েই হাসতে হাসতে পুঁটির দম বন্ধ।

—ও তিনু—তিনু—রে—শোন্ শোন্ একটা মজার কথা—

তিনু চার বছরের খুড়তুতো ভাই। উঠোনের নীচে দিয়েই যাচ্চে। সে মুখ উঁচু করে ওর দিকে চেয়ে বললে—কি লে ডিডি?

—জানিস্? এই আমাদের বাড়ি বর আসবে—

—বল?

—হ্যাঁ-রে। ধুতরো ফুলের মালা পরে বলদের গাড়ি চেপে ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে—হি—হি—

নব জীবনের প্রান্তে

তিনু না বুঝে হাসলে—হি হি—

এই সময়ে ওদের জ্যাঠাইমা বাড়ির ছেলেমেয়েকে ডাক দিলেন—ওরে, সবাই এসে কাঁটাল খেয়ে য্য—ও হিমু, পান্ত ভাত কে কে খাবে ডাক দিয়ে নিয়ে আয়। এক হাঁড়ি পান্ত রয়েচে সেগুলো কাঁটাল দিয়ে ওঠাতে তো হবে। ভাত ফেলতে পারবো না এই যুধ্যের বাজারে—

পান্ত ভাত ও কাঁঠাল পুঁটির অতি প্রিয় খাদ্য। কিন্তু আজ এখন তার খাবার নাম করবার যো নেই—খিদেও পেয়েছিল, ইচ্ছে করলে সে কলসী থেকে কাঁটালবীচি ভাজা আর মুড়ি লুকিয়ে পেড়ে নিয়ে খেতে পারতো—কিন্তু সে ইচ্ছে তার নেই। তাতে ভগবান রাগ করবেন। আজকের দিনে সে ভগবানকে রাগাবে না।

বেলা বাড়লো। ও বাড়িতে শাঁক ও হুলুর শব্দ শোনা গেল। অবিশ্যি খুব কাছে নয় পুঁটির ভাবী শ্বশুরবাড়ি—তা হোলেও শাঁকের শব্দ না আসবার মত দূরও নয়।

ওর খুড়তুতো বোন শ্যামা বল্‌লে—ওই শোন দিদি, দাদাবাবুর গায়ে হলুদ হচ্চে—

পুঁটি ধমক দিয়ে বল্‌লে—চুপ্। মেরে ফেলে দেবো। দাদাবাবু কে?

—বা-রে, হয়েচেই তো—আর ত দুদিন দেরি—

—না। তা হোক্। আগে থেকে বলতে নেই।

—জ্যাঠাইমা তো বলচে?

—কি বলচে?

—বলচে, আমাদের জামাইয়ের গায়ে হলুদ হচ্চে—সেখান থেকে তত্ত্ব নিয়ে নাপিত এবার এসে পৌঁছে যাবে—

—তা বলুক গে। আমাদের বলতে নেই।

—আচ্ছা দিদি—দাদাবাবু—ইয়ে সুবোধবাবু পাশ করেচে ?

—খবর এখনও বের হয় নি।

—আমি ও পাড়ায় রাধীদের বাড়ি গিইছিলাম এই এটু আগে। রাধীর দাদা পাশ করেচে, কাল বিকেলে কলকাতা থেকে ওর কাকা খবর দিয়েচে।

—তোর দাদাবাবুর—ইয়ে মানে ওর—দূর, ওই কেশববাবুর ছেলের খবর কে পাঠাবে কলকাতা থেকে ? ওদের তো কেউ নেই কলকাতায়।

একটু পরে ওদের বাড়িতে শাঁক বেজে উঠলো, হুলু পড়লো। নাপিতে তত্ত্ব নিয়ে আসচে তেঁতুলতলার পথে, বাড়ি থেকে দেখা গিয়েচে।

পুঁটির বুক আনন্দে দুলে উঠলো—জ্যাঠাইমা বলছিলেন, আশীর্ব্বাদ হয়ে গেলেও বিয়ে না হতে পারে, কিন্তু গায়ে হলুদ হয়ে গেলে বিয়ে নাকি আর ফেরে না।

এবার তা হোলে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপারটা তার জীবনে ঘটে গেল।

কেউ আর বাধা দিতে পারবে না। পাড়াগাঁয়ে কত রকমে ভাঙ্‌চি দেয় লোকে। তার বিয়েতেও ভাঙ্‌চি দিয়েছিল। বলেছিল, মেয়ের রং কালো, মুখ-চোখ ভালো না—লেখাপড়া জানে না—আরও কত কি কিন্তু সুবোধ—না। ছিঃ, ও নাম করতে নেই, নাম হিসেবে মনে ভাবতে নেই।

তারপর বাকি অনেকগুলো কি ব্যাপার যেন স্বপ্নের মত তার চোখের সামনে দিয়ে ঘটে গেল। শাঁকের ডাক, হুলুধ্বনি—মা, কাকীমা,

জ্যাঠাই মা তাকে তেলহলুদ মাখিয়ে দিলেন। গায়ে হলুদের তত্ত্ব এল লালপাড় শাড়ি, তেলহলুদ, একটা বড় মাছ, এক হাঁড়ি দই। তার সমবয়সী বন্ধু তিনজন খেতে এল তাদের বাড়ি। তাকে কাছে বসিয়ে কত যত্ন করে মাছ দিয়ে, দই দিয়ে, মা জ্যাঠাইমা কত আদর করে খাওয়ালেন, কত মিষ্টি কথা বল্লেন। সোনার পিঁড়িতে সিঁদুর দেওয়া হ'ল, প্রদীপ দেখানো হ'ল—যাতে শূন্য ধানের গোলা সামনের ভাদ্র মাসে আউশ ধানে অন্তত অর্দ্ধেকটা পুরে যায়। বাবা বলেন, গোলার ধান খালি হয়ে যেতো না। মধ্যে কি একটা গভর্ণমেণ্টের হাঙ্গামা এল —কেউ গোলায় ধান জমিয়ে রাখতে পারবে না। তাতেই অনেক ধান কর্জ দিতে হ'ল গ্রামের লোকজনকে।

গায়ে হলুদের তত্ত্বে আরও অনেক জিনিস এসেছিল, খাওয়া দাওয়ার পরে গাঁয়ের মেয়েরা কেউ কেউ দেখতে এল—তখন সে নিজেও দেখলে। আগে লজ্জায় ওদিকেও সে যায় নি। একটা শাড়ি, একটা ব্লাউজ, সায়া একটা—আলতা, সাবান, আয়না আর গন্ধ তেল। এ সব জিনিস তার নিজস্ব। কা'রও ভাগ নাই এতে। সে ইচ্ছে করে যদি কাউকে দেয় তবেই সে পাবে, নইলে নিজের বাক্সে রেখে দিতে পারে, কা'রও কিছু বলবার নেই।

সব কাজ মিটতে বেলা দুটো বেজে গেল।

পুঁটির মন ছট্‌পট্ করছিল, ও পাড়ার লতিদি, হিমি, অন্ন, রাধী—এরা কেউ আসে নি—এদের গিয়ে একবার দেখা দেওয়া দরকার—যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তার গায়ে হলুদের মত আশ্চর্য্য ব্যাপারটা আজ সত্যিই ঘটে গিয়েচে। আচ্ছা, যখন ইংরিজি বাজনা

বাজিয়ে বর আসবে তাদের বাড়ির দোরে তেঁতুলতলার ওই পথটা দিয়ে, বোধনতলার কাছে পাল্‌কি নামিয়ে প্রণাম করে—বাজি পুড়বে, লোকজনের হৈ হৈ হবে—ওঃ, সে সময়ের কথা ভাবাও যায় না। ত্যাখে যেন পাড়ার সব মেয়েরা এসে।

সে বেড়াতে বেড়াতে গেল মুখুজ্যে বাড়ি। মুখুজ্যে গিন্নী ওকে দেখে বল্‌লেন—কি রে পুঁটি, আয় মা আয়। গায়ে হলুদ হয়ে গেল? আহা, এখন ভালোয় ভালোয় দু-হাত এক হয়ে গেলে—বোসো মা, বোসো।

একটু পরে লতিকাও সেখানে এসে হাজির হোল। পুঁটিকে দেখে বল্‌লে—ও পুঁটি, তোর আজ গায়ে হলুদ ছিল না? হয়ে গেল? কি তত্ত্ব এল শ্বশুরবাড়ি থেকে?

মুখুয্যে গিন্নী বল্‌লেন—বোস্ মা তোরা। লতি পুঁটির সঙ্গে গল্প কর। একটু চা করে আনি। যাক্, ভালোই হ'ল, আজকাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি কষ্ট, যে দেয় সেই জানে।

পাশের বাড়ির জানলা দিয়ে গাঙ্গুলিদের ছোট বৌ ডেকে বললে—ও কে পুঁটি নাকি? গায়ে হলুদ হয়ে গেল? তা কই আমাদের একবার বলতেও তো হয়। এই বাড়ির পেছনে বাড়ি—

পুঁটি বল্‌লে—গেলেন না কেন বৌদি? আমরা তো বারণ করিনি যেতে। শাঁক যখন বাজলো, তখনও যদি যেতেন—

লতিকা ভাবলে, পুঁটি ছেলেমানুষ, এ উত্তরটা দেওয়া ওর উচিত হ'ল না। এখানে ও কথা বলা ঠিক হয় নি। কিন্তু এর পরবর্ত্তী ব্যাপারের জন্যে সে বা পুঁটি কেউ প্রস্তুত ছিল না। গাঙ্গুলিদের ছোট বৌ মুখ লাল করে উত্তর দিলে—কি বল্‌লি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

আমরা কখনও গায়ে হলুদ দেখিনি, শাঁকে ফুঁ পড়তে অমনি কুকুরের মত ছুটে যাবো তোমাদের বাড়ি পাতা পাততে? অত আংখার ভাল নয় রে পুঁটি। তোমার বাপের বড্ড ধানের গোলা হয়েচে, না অমন বিয়ে আমরা কখনও কি দেখিচি জীবনে? ছেলের না আছে চাল, না চুলো—সংসারে মানুষ নেই বলে হাঁড়ি ঠেলতে নিয়ে যাচ্চে। ছেলের বিদ্যে কত, তা জানতে বাকি নেই—এবার তো ম্যাট্রিক ফেল করেচে—

এখানে লতিকা আর না থাকতে পেরে বল্লে—কে বল্লে ছোট বৌদি? সুবোধ বাবুর পাশের খবর তো পাওয়া যায় নি?

—কেন পাওয়া যাবে না? চিঠি এসেচে ফেল করেচে বলে—ওরা সে চিঠি লুকিয়ে ফেলেচে। বিয়ের আগে ও খবর জানাজানি হতে দেবে না। উনিই হাট থেকে চিঠি আনেন। পোষ্টকার্ডের চিঠি। উনি সন্দের পর সুবোধের বাড়ি দিয়ে এলেন। আমাদের চোখে ধূলো দেওয়া—

পুঁটির চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে বিশ্বসংসার লেপে মুছে গিয়েচে! মুখরা দর্পিতা ছোট বৌয়ের মুখের কাছে সে কি করে দাঁড়াবে। চেঁচামেচি শুনে মুখুয্যে গিন্নি হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন, লতিকা ওর হাত ধরে নিয়ে ঘরের মধ্যে গেল।

মুখুজ্যে গিন্নি ঘরের মধ্যে এসে চাপা গলায় বললেন—আহা, ছেলেমানুষ—ওর সাধ-আহ্লাদের দিনটা অমন করে বিষ ছড়াতে আছে—ছিঃ ছিঃ—দ্যাখ তো মা লতি কাণ্ডটা—

কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্ট পুঁটির হাত ধরে ততক্ষণ লতিকা বলচে—চল্ চল্ পুঁটি তোকে বাড়ি দিয়ে আসি—ছিঃ বৌদির কি কাণ্ড! ও সব কথা মনে করিস নে, মিথ্যে কথা। চল্ পুঁটি—ভাই—

লতিকার গলার সুরে ও কথার ভাবে কিন্তু পুঁটির মনে হ'ল লতিদিও এ খবরটা জানে—কি জানি হয়তো গাঁয়ের সবাই জানে—সে-ই কেবল জানতো না এতক্ষণ। পথে পা দিয়েই লজ্জায় অপমানে সে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলে বললে—লতিদি, আমি কি বলেছিলাম ছোট বৌদিকে ?—খারাপ কথা কিছু ?

রাণুর বিবাহ

নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে রাণু। রাণুর বিবাহ। বাপ ষাট টাকা বেতনে স্কুলে মাষ্টারী করেন। মেজকাকা উকীল, ছোটকাকা ডেপুটী। উপার্জ্জনের দিক হইতে আয়ের সমষ্টি অল্প নয়, কিন্তু সংসারটি বৃহৎ। সংসারে তিন ভাইয়ের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা উনিশ; এ ছাড়া এক ভাগিনেয়ীর এক ছেলে, এক ভাগিনেয়ের পুত্রও এই সংসারে থাকিয়া পড়াশুনা করে। ইহার পূর্ব্বে চার ভাগিনেয় এখানে থাকিয়া পড়া-

শুনা শেষ করিয়াছে, এখন অন্যত্র কাজকর্ম্ম করিতেছে। একজন উকিল, দুইজন ডাক্তার। চার-পাঁচ ভাগিনেয়ীর বিবাহও এই বাড়ী হইতে হইয়াছে। মোটকথা, ধনসমাগমের পথ সুগম হইলেও নির্গমনের পথ ততোধিক সরল ও সুগম বলিয়া হাঁটুবলে উপরের দিকে ত কখনও উঠিলই না, বরং দিন দিন নীচের দিকেই নামিয়া চলিয়াছে।

রাণু মেয়েটি সুন্দরী নয় তবে সুশ্রী। ফাগ্যও ভালই বলিতে হইবে যে, পাত্রপক্ষ নিতান্ত অল্পেই প্রসন্ন মনে কন্যাটিকে গ্রহণ করিতে রাজী হইয়া গেল। পাত্রটিও ভাল সরকারী চাকুরে, সদ্য সদ্য পুলিস সাব-ইন্সপেক্টরীতে ভর্ত্তি হইয়াছে। বয়স তেইশ-চব্বিশ—দেখিতেও শ্রীমান।

রাণুর বাপ ভোলানাথবাবু কথাবার্ত্তা পাকা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ভোলানাথবাবু সরাসরি অন্দরে গিয়া পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন—আপনার আশীর্ব্বাদে সব ঠিক হয়ে গেল মা।

মা তরকারী কুটিতেছিলেন—তরকারী কোটা ফেলিয়া দিয়া দুইটি হাত অর্দ্ধোত্তোলিত করিয়া যেন দারুন দুশ্চিন্তাটাকে চিরতরে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—যাক্, বাবা, বাঁচলাম! বৌমা—বৌমা—অ বড় বৌমা—শুনছ, রাণুর বিয়ে আজ পাকা হয়ে গেল।

রাণুর মা ও খুড়ি অদূরে ঘোমটা দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

মা আবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—দেখ্ ত' রে, সুকুমারী কোথায় গেল? ডাক্ তাকে। ভবানী, সুরো—এদের ডাক্।

সুকুমারী ভোলানাথবাবুর মাসীমা, ভবানী বিধবা ভগ্নী; সুরমা বিধবা ভাগ্নী—ভোলানাথবাবুর অপর এক ভগ্নার কন্যা।

নব জীবনের প্রান্তে

ভবানী পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—এই যে আমি। সুরোও এই ঘরে রয়েছে। আমি শুনেছি, সুরো হয় ত শুনতে পায়নি। সুরো—অ—সুরো!

অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির, যেন মাটীর প্রতিমার মত মেয়ে সুরমা। সে আপন অভ্যাসমত আসিয়া দাঁড়াইল, চোখে মুখে কোনও ঔৎসুক্য নাই, দৃষ্টিতে কোনও প্রশ্ন নাই—নিতান্ত ভাবলেশহীন মুখ, সে আসিয়া শুধু যেন কোনও আদেশ প্রতিপালনের জন্যই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

ভোলানাথবাবুর মা ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—সুরো, শুনেছিস্, রাণুর বিয়ের কথা আজ পাকা হয়ে গেল।

সুরমা কানে ভাল শুনিতে পায় না।

সে অতি মৃদু একটু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—সে শুনিয়াছে, অথবা—বেশ, বেশ!

—কে রে—সর্, কে রে? সর্—সর্—এ্যাড়া কাপড়ে ছুঁস্‌নে। আঃ, তুই আবার হাঁ ক'রে দাঁড়ালি কেন?

ইতিমধ্যে কখন ছেলেরা আসিয়া ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহাদের পিছন হইতে ভোলানাথবাবুর মাসীমা হাঁকিতেছিলেন—সর্ —সর্!

যে ছেলেটা পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহার হাত ধরিয়া সরাইয়া লইয়া ভোলানাথবাবু বলিলেন—সরে এস না, বিভূতি, শুনতে পাচ্ছ না, তোমায় সরে যেতে বলছেন!

পথ মুক্ত পাইয়া মাসীমা হাতের ঘটীটা হইতে গোবরজল-ছড়া দিতে দিতে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—বিয়ের ঠিক হয়ে গেল, দিদি?

উত্তর দিলেন ভোলানাথবাবু—হ্যাঁ, মাসীমা, সব ঠিক হয়ে গেল, দিনও ঠিক হয়ে গেল। আসছে মাসের ৪ঠা আর ১২ই—মানে পাত্র যেদিন ছুটি পায়!

—লগ্নপত্র করেছ ত' বাবা?

ভোলানাথবাবু বলিলেন—সে আবার কি, মাসীমা?

ঐ ত' বাবা, তোমরা সব সায়েব হয়ে সব ভুলে গেলে। লগ্নপত্র হবে, তার মাথায় সিঁদুর দেওয়া হবে, দুই পক্ষ তাতেই সই করবে—

রমানাথবাবু বলিলেন—Marriage contract বোধহয়।

মাসীমা বলিলেন—ওই ত' বাবা, বিয়ে সুদ্ধ তোমরা ইংরেজী করে ফেললে! আর তোমাদেরই বা কি দোষ দেব বল—মেয়েদের হাল দেখে যে অবাক হই গো। বিয়ের পাকা কথার খবর এল—আর বাড়ীর এয়োরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে,—দেখ না! সব মেমসাহেব হয়ে পড়েছে, শাঁখ বাজাতে ভুলে গেছে, উলু দিতে লজ্জা করে—

এতক্ষণে মা বলিয়া উঠিলেন—ও মা, তাই ত, শাঁখ বাজাও, বৌমা উলু দাও সব। কি হ'লে গো তোমরা—ছি—ছি-ছি!

বাড়ীর এয়োরা এতক্ষণে চঞ্চল হইয়া উঠিল; একজন তাড়াতাড়ি শাঁখ আনিতে ছুটিল।

ভোলানাথবাবুর বড় মেয়ে ছিনু খুঁজিতেছিল রাণুকে; এদিকে ও-দিকে চাহিয়া দেখিতে না পাইয়া সে বোধকরি সমবেত সকলকেই প্রশ্ন করিল—রাণু কই গো, রাণু কই? রাণু—রাণু!

মাসীমা বলিলেন—এই, রাণু রাণু ক'রে পাগল হয়ে উঠলেন একেবারে! যত সব মেমসাহেবী ঢং দেখলে গা জ্বালা

করে আমার। আরে, আগে শুভকাজ মঙ্গল-আচারগুলো সেরে ফেল!

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনিতে বাড়ীখানা মুখরিত হইয়া উঠিল।

মাসীমা এতক্ষণে পরিতুষ্ট হইয়া গোবরজল-ছড়া দিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট ঘরখানিতে যাইতে যাইতে বলিলেন—এই ত'! সংসার-ধর্ম্মকে দিয়ো সকলের উঁচু আসন—আচার-ভ্রষ্ট হ'লে কি হিঁদুর সংসার টেকে?

বাহিরের ঘরে ছেলেদের মধ্যে বড়দের তখন জটলা বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। ভোলানাথবাবুর মেজ ছেলে গোপাল খবরটা লইয়া আসিল।

বড় ভাই গোবিন্দ বেকার, সে তখন ছোট একটা আয়না দেখিয়া কেশপ্রসাধনের নূতন একটা ভঙ্গী আবিষ্কারের গবেষণায় নিমগ্ন ছিল। রমানাথবাবুর বড় ছেলে সুধাংশু নিতান্ত অকারণে গভর্ণরের কাছে একটা দরখাস্তের খসড়া লিখিতেছিল; ভোলানাথবাবুর ভাগ্নের ছেলে শ্যামল গোপনে রচনা করিতেছিল একটা কবিতা। ভগ্নী ভবানীর দৌহিত্র রমেন অঙ্কের খাতায় একটা পাঁচতলা বাড়ীর নক্‌সা লইয়া চিন্তায় বিভোর।

গোপাল যেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিয়া ফেলিল—রাণুর বিয়ে পাকা হয়ে গেল, দাদা!

গোবিন্দ আয়নাখানা ফেলিয়া দিয়া বলিল Finally settled ত?

সুধাংশু দরখাস্তখানা ফেলিয়া কাছে আসিয়া বলিল—কবে?

শ্যামল প্রশ্ন করিল—সেই শ্রীকুমারবাবুর সঙ্গেই ত?

রমেনও কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সে কোনও প্রশ্ন খুঁজিয়া না পাইয়া এই প্রশ্নগুলির উত্তর শুনিবার প্রতীক্ষায় নীরব হইয়া রহিল।

গোপাল উত্তর দিল—একেবারে final হ'য়ে গেল আজ। দিন ঠিক হয়েছে দুটো—একটা ৪ঠা আর একটা ১২ই—যেদিন শ্রীকুমারবাবুর ছুটি পাওয়ার সুবিধে হবে আর কি! পুলিশের চাকরী ত—এ্যাঁ?

বাড়ীর ভিতরে তখন মায়ের চারিধারে ঘন হইয়া বসিয়া পরামর্শ-সভা চলিতেছে। মা বলিতেছিলেন—সময় থাকতে চিঠি দেওয়াই ভাল—তাদেরও সব ঘরসংসার গুছিয়ে আসতে হবে ত। ননী নিশ্চয় আসবে, মণিকে নিয়েই ভাবনা, তার আবার নানা ঝঞ্ঝাট। শিবানী ত' আসবেই, সমরও আসবে। হ্যাঁ, সমরের বৌ আছে বাড়ীতে, সেখানেও একটা চিঠি দাও।

মা এবার নীরব হইলেন।

কথা হইতেছিল মায়ের মেয়েদের আসিবার। ভোলানাথবাবুর সাত বোন। ভবানী অবসর পাইয়া বলিল—শ্যামাও আসবে।—ভুলু, আমি তাকে আগেই লিখেছি। জামাইও পাঠিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন। এখন তোমরা জামাইকে একটা চিঠি দাও।

শ্যামা ভবানীর কন্যা।

ভোলানাথবাবু ওদিকের উঠানের কোণে একটি ছেলের কান্নায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আঃ, রঙ্গীনটা কাঁদছে কেন? ওরে রাণু, দেখ্ না বেরিয়ে। আমি বারবার রাণুকে বলি—ওরে, ছেলেদের দিকে একটু

নজর রাখিস্ তুই। এঁ্যা—একি—দেখি দেখি—! টিঞ্চার আইডিন! টিঞ্চার আইডিন!

চিবুকটা কাটিয়া রক্তে সমস্ত বুকটা রক্তাক্ত করিয়া রঙ্গীন কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া দাঁড়াইল।

মেজভাই রমানাথবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিল—বেঞ্জইন দিয়ে সীল করে দিন!—বেঞ্জইন—টিন্‌চার বেঞ্জইনের শিশিটা কোথায় গেল? বলিয়া তিনি হাঁকিতে আরম্ভ করিলেন—গোবিন্দ—গোপাল—সুধাংশু!

গোবিন্দ তখন বলিতেছিল—দেখ, পাঁচজন বাইরের ভদ্রলোক আসবেন—তাদের সামনে···অথচ বাবা হয় ত' বলবেন, ওই জামাতেই হবে। ওইটে কি একটা জামা! পাঁচ বছরের পুরোনো হয়ে গেল। অন্তত একটা ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবী—ডীপ চকোলেট কি গ্রে রঙের, আর একজোড়া জুতো।

সুধাংশু বলিল—আমি ত' একটা সার্জ্জের কোট নেব—নেভি-ব্লু কালার বেশ ডিসেণ্ট!

গোপালের বেশী সখ একটা পুল-ওভারের, সে বলিল—আমার একটা পুলওভার হ'লেই হবে। কমে হবে, এ সময় খরচ বেশী করা ত' ঠিক নয়—এঁ্যা?

শ্যামল বলিল—একটা প্রীতি-উপহার কিন্তু খুব ভাল চাই!

রমেশ ভাবিতেছিল, চুলটা আজ আর না কাটিয়া সেই সময়েই কাটিবে, সেই ভাল হইবে।

রাণু তখন সদ্যঃস্নানান্তে কাপড় ছাড়িয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছিল—মুখে তাহার অতি মৃদু মধুর একটু হাস্যরেখা।

পুরাতন সোজা সিঁথিটা মুছিয়া দিয়া তাহার সখ হইল বাঁকা সিঁথি টানিবার! চিরুণীটা দিয়া পিছনের দিকে চুলের রাশি সমানভাবে ঠেলিয়া পুরাতন সিঁথিটি মুছিয়া বাঁ দিকে সবে সিঁথিটা টানিয়াছে—এমন সময় রক্তাক্ত রঙীনকে কোলে করিয়া ভোলানাথ বাবু ঘরে ঢুকিয়া রাণুকে দেখিয়া বলিলেন—এই যে, ও—চুল আঁচড়ান হচ্ছে! কিন্তু এ রকম বিলাসিতা ত' ভাল নয়। চুল আঁচড়াতেই যদি তোমার দু ঘণ্টা যায়—।

ওপাশ হইতে রমানাথবাবু বলিয়া উঠিলেন—Up-to-date হচ্ছেন! Most ludicrous!

ভোলানাথবাবুর মাও উঠিয়া আসিয়াছিলেন; তিনি বলিলেন—আমাদের তখন বিয়ের কথা হ'লে, সে যেন একটা দারুণ লজ্জার কথা হ'ত। আমরা কারো সামনে বেরুতাম না!

গোবরজল ছড়া দিতে দিতে মাসিমা কোথায় যাইতেছিলেন; ঘরের মধ্যে জটলা দেখিয়া তিনি উঁকি মারিয়া বলিয়া উঠিলেন—রাম-রাম-রাম, ওকি সিঁথি হয়েছে, মাগো! ধিঙ্গি মেয়ের ফিরিঙ্গী হতে সাধ হয়েছে বুঝি বিয়ের কথা শুনে! মুছে ফেল, মুছে ফেল বলছি, ও বিচ্ছিরী সিঁথি!

রাণু পাংশুমুখে রোরুদ্যমান রঙ্গীনকে কোলে লইয়া সেখান হইতে পলাইবার পথ খুঁজিতেছিল।

দিন কয়েক পর। অগ্রহায়ণের ৬ই তারিখ। ৪ঠা তারিখে পাত্রের ছুটি পাওয়া সম্ভব হয় নাই বলিয়া ১২ই বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে।

নব জীবনের প্রান্তে

ভোলানাথবাবু কয়খানা চিঠি হাতে বাড়ী ঢুকিয়া বলিলেন—মা, শিবানী-দিদি ত' কাল আসছেন। ননী-দিদি লিখেছেন, সম্ভব হলে বিয়ের আগের দিন এসে পৌঁছবেন। মণি-দিদি আসতে পারবেন না। হ্যাঁ, শিবানী দিদির সঙ্গে ওঁর ছোট মেয়ে প্রতিমা আসছে। আর তিনি লিখেছেন, অণিমাকে আনবার জন্যে যেন আজই কাউকে শক্তিগড়ে পাঠান হয়। অণিমা অনেকদিন আসেনি। জামাই পাঠাতে রাজী হয়েছেন।

অণিমা শিবানীর মেজ মেয়ে।

মা বলিলেন—তা' হলে গোবিন্দকে পাঠিয়ে দাও আজই। আর সমর, বিমল আসছে কবে?

সমর শিবানীর পুত্র—ডাক্তার। বিমলও অন্য এক দৌহিত্র—সেও ডাক্তার।

—সমর বিয়ের আগের দিন আসবে, আবার বিয়ের পরদিনই চলে যাবে। ডাক্তার মানুষ। বিমল আরও একদিন আগেই আসবে। তবে, সে লিখেছে আপনার যে, সে এসে শ্বশুরবাড়িতেই উঠতে চায়, কারণ এখানে ত' লোকজনের ভিড় হবে—তার নানারকমের অসুবিধে। আমি ত' বলি মা, এ খুব ভাল প্রস্তাব। কি বলেন।

মা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া থাকিয়া পরে বলিলেন—বেশ, তাই লিখে দাও।

ভবানী জিজ্ঞাসা করিল—শ্যামা কোন পত্র দেয়নি, ভুলু?

তাড়াতাড়ি একখানা পত্র বাহির করিয়া ভবানীর হাতে দিয়া বলিল—এই যে। শ্যামা আসবে তিন দিনের জন্যে—এই যে চিঠি দিয়েছে।

গোবর-জল-ছড়া দিতে দিতে সুকুমারী কোথায় যাইতে যাইতে দাঁড়াইয়া বলিলেন—ও বাবা ভুলু, বিয়ের বাজার করতে যখন যাবে আমার জন্যে একপ্রস্থ কোশাকুশী কিনে এনো, মাণিক। তোমার মেয়ের বিয়ে—মাসীকে ওটা তোমায় বিদেয় দিতে হবে।

তাড়াতাড়ি ভোলানাথ বলিলেন—বেশ ত' মাসীমা' বেশ ত'।

—হ্যাঁ, বাবা, বেশ একটু ভারী দেখে—আর গড়নটা যেন ভাল হয় —ঠিক যেন কলার মোচার ধরণের।

মা বলিলেন—হ্যাঁ ভুলু, গোপাল সুধাংশু বড্ড ধরেছে আমাকে—একটা প্রীতি-উপহার—

—না-না মা, অনর্থক বাজে খরচ ক'রে কি হবে বলুন! ও আপনি প্রশ্রয় দেবেন না। আমি ওদের 'না' ব'লে দিয়েছি।

—আমিও বলেছিলাম, হবে না,—কিন্তু ওরা আমার নামে কবিতাটা লিখে এনেছে।

বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, তারপর আবার বলিলেন—বেশ লিখেছে রে, শুনবি তুই? কি—দাঁড়া—'কত গরু-খোঁজা ক'রে পেয়েছি তোমারে ছেড়ে ত' দিব না আর হে'। এমনি ঠাট্টা করে লিখেছে। তা' দু তিন টাকা খরচ ত'! যখন এত হবে তখন ওদের সাধটাও মিটুক।

সুকুমারী বলিলেন—আমার আর দাঁড়াবার অবসর নেই বাবা, তবে মনে থাকে যেন—বেশ একটু ভারি দেখে আর এই কলার মোচার মত ঢংয়ের।

তিনি চলিয়া গেলেন।

ভবানী বলিল, ভুলু, রমেনের একটাও জামা নেই যে ভদ্দর লোকের সামনে বেরোয়—ওর একটা জামা—

ভোলানাথবাবু বলিলেন—বাইরে দর্জ্জি এসে মাপ নিচ্ছে দিদি, রমেনের মাপ নিয়ে নিয়েছে।

বাহিরে তখন রমানাথবাবু বসিয়া ছেলেদের জামার মাপ দেওয়াইতে-ছিলেন। গোবিন্দের পাঞ্জাবী, সুধাংশুর নেভি-ব্লু রংয়ের সার্জ্জের কোট, রমেনের গরম কাপড়ের কোটের মাপ দেওয়া হইয়া গেল। গোপালের পুলওভার এবেলাতেই আসিবে। সে টাকার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

রাণুর বড় বোন চিনু মাকে গিয়া বলিল—মা, রাণুর বড় ইচ্ছে যে, ওকে একটা ফার-কোট কিনে দেওয়া হয়। ওর ভারি সাধ।

রাণুর মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ওঁকে বলতে যে ভয় করছে, মা। কিছু বললেই একেবারে যেন মারতে আসছেন।

চিনু বলিল—ওর ওটা বড় সাধ, মা!

রাণুর মা চুপ করিয়া রহিলেন।

এদিক হইতে ভোলানাথবাবু চীৎকার করিতেছিলেন—না-না তোমাকে যেতে হবে না, দাও-দাও আমাকে দাও—আমি নিজেই যাব।

ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল গোপালকে লইয়া। সে পুল-ওভারের মূল্যের অপেক্ষায় ছিল, এমন সময়, ভোলানাথবাবু আদেশ করিলেন—চিঠি ক'খানা ডাকে দিয়ে এস ত!

চিঠি কয়খানা হাতে লইয়া গোপাল দাঁড়াইয়া রহিল। ভোলানাথবাবু বলিলেন—যাও।

—পুল-ওভারের টাকাটা পেলে বাজার হয়ে—

সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথবাবু যেন জ্বলিয়া উঠিলেন,—দাও দাও, চিঠি ফিরিয়ে দাও আমাকে—আমি নিজে যাব।

গোপাল দৃঢ়-মুষ্টিতে চিঠি কয়খানা ধরিয়া কহিল—না।

ভোলানাথবাবু চিঠি কয়খানা সজোরে তার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—না-না, তোমাকে যেতে হবে না। আমি নিজে যাব, দাও দাও।

চিঠি কয়খানা লইয়া তিনি ঘরে আসিয়া ডাকিলেন—বড় বৌ, বড় বৌ!

রাণুর মা তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে আসিয়া বক্তব্যের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইলেন। ভোলানাথবাবু বলিলেন—দাও ত' তোমার কাছে যে চল্লিশটাকা আছে, সেটা দাও ত'!

রাণুর মা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কি করবে?

—আঃ—যাই করি না, গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে আসব না—দাও।

—না, সে টাকায় আমি রাণুর একটা আংটী আর ঝুমকো গড়িয়ে দেব। হ্যাঁ—আর রাণুর বড় সাধ একটা ফারকোট—

—ফারকোট! বিস্ময়ে ভোলানাথবাবুর চোখ দুইটি বড় হইয়া উঠিল।

রাণুর মা আশঙ্কায় চুপ করিয়াই রহিল, কোন উত্তর দিল না। কথার ফুৎকারের অভাবে ভোলানাথবাবু আর জ্বলিয়া উঠিতে পারিলেন না,

ধূমায়মান অবস্থাতেই বলিলেন—ফারকোট পরে ক'রো। আর ঝুমকো আংটীও থাক্—ও ত' চুক্তির মধ্যে নয়। এখন টাকাটা আমাকে দাও।

—রাণুর বড় সাধ—! অসহায় ভাবে রাণুর মা অসমাপ্ত কথাগুলি বলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—সাধ তার অনেক কিছু হতে পারে, জড়োয়া গহনা, মুক্তোর মালা, হীরের মুকুট, পান্নার দুল—কিন্তু সে আমার দেবার সাধ্য নেই।

ওদিকে বাহিরে রাণুকে লইয়া একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেছে। স্নানের ঘরের দরজায় সুকুমারী ঠাকুরাণী মিনিট-দশেক অপেক্ষা করিয়া ধাক্কা মারিতে আরম্ভ করিলেন—কে ঘরে রয়েছে, কে—এতক্ষণেও স্নান হয় না? কে রয়েছিস্?

রাণু সাধ করিয়া একখানা লাক্স সাবান মাখিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি কোনরূপে স্নান সমাপ্ত করিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিতেই সুকুমারী বলিলেন—ও মা, যাব কোথায় আমি! এত সাবান মাখার ধুম! ছি-ছি ছি! এই ঠাণ্ডা, আর এতক্ষণ ধ'রে সাবান মেখে স্নান!

ভবানী রাণুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—ওমা, এযে মুখ-চোখ এর মধ্যেই রাঙা হয়ে উঠেছে!

সত্যই অত্যধিক সাবান-ঘষার ফলে রাণুর মুখের ফর্সা রঙ রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। রমানাথবাবু ঘরে ছিলেন, তিনি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—দেখ, তুমি অত্যন্ত—থাক্। এখন ওকে কুইনিন খাইয়ে দিন একটা। আর এক কাজ করুন—ছেলেদের একজোড়া মোজা দেখে ওকে দিন ত', মোজা পায়ে কারও একজোড়া স্যাণ্ডেল নিয়ে চলা ফেরা করুক;

তাতে ঠাণ্ডা লাগার ভয়টা একটু কমবে। বলিয়া নিজেই ঘর খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনিলেন একটা কালো ও একটা লাল রঙের মোজা।

রাণু মোজা-জোড়াটা হাতে করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার এই বিসদৃশ পোশাক পরিতে চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছিল। রমানাথবাবু পুনরায় আদেশ করিলেন—প'রে ফেল্।

এবার রাণু কহিল—আমার ঠাণ্ডা লাগবে না।

—ঠাণ্ডা লাগবে না! রমানাথবাবু ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে রাণুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ কারণটা অনুমান করিয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন—I see, তোমার লেডিজ সিল্ক্ মোজা না হ'লে পছন্দ হচ্ছে না! তারপর ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—দিদি, বলুন ওর বাপকে, মেয়েকে লেডিজ সিল্ক স্টকিং কিনে দিতে, নইলে ওর পছন্দ হচ্ছে না!

রাণু সভয়ে ত্রস্তভাবে মোজা দুইটি টানিয়া লইয়া সেইখানেই বসিয়া পায়ে পরিয়া ফেলিল। পরিয়াও কিন্তু রাণুর চোখ ফাটিয়া জল আসিল —সে নত মাথা আরও খানিকটা নত করিল, চোখের জল মাটিতে পড়িয়া মুহূর্ত্তে শুষিয়া গেল।

ভোলানাথবাবুর মা ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন—রমানাথ, টেকো দিয়ে সুতো কেটে দিতে হবে যে বাবা!

সুকুমারী স্নানের ঘর হইতেই হাঁকিয়া বলিলেন—অ দিদি—কলসীতে আলপনা দেবে কখন—আজই ত' দেবার কথা।

মা উত্তর দিলেন—এই বস্ল বোধ হয় সব। ও-মা, উলু দিতে বল —শাঁখ বাজাতে বল! কথাটা শেষ হইতে না হইতেই শাঁখের শব্দের সঙ্গে উলুধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাণু ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া ছাদের

এক কোণে নিরালায় বসিয়া ভালো করিয়া কাঁদিয়া লইল। সমস্ত সংসারের উপর তাহার মন বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

বিবাহের দিন। ভোলানাথবাবুর ও রমানাথবাবুর নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। আত্মীয়-স্বজনে ঘর পরিপূর্ণ হইয়াছে। সমর আসিয়াছে, বিমল আসিয়াছে; প্রতিমা, অণিমা, শ্যামা তাহারাও সবেমাত্র আসিয়া পৌঁচিয়াছে। শিবানী এবং আর এক বোন আসিয়াছে।

ইলেকট্রিক মিস্ত্রী তার খাটাইতেছিল। ভোলানাথবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিলেন—সমর কোথায় গেল, সমর?

কে বলিল—তিনি মোটরের কি পার্টস্ চাই, তা কেনবার জন্য গেছেন।

—বিমল, তাহ'লে তুমি একবার স্টেশনে যাও না, বাবা—

বিমল মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—আর কেউ গেলে হয় না? আমি একটু হারটার ক্লিপটা এঁটে আনতে যাচ্ছি।

—অ—তা'হলে দেখি! গোবিন্দ কোথায়?

গোবিন্দ তখন অণিমা, প্রতিমা ও সমরের ছেলেমেয়েদের জামার মাপ দেওয়াইতেছিল। অণিমার ছেলের প্রতিমার ছেলেদের মত স্যুট হইবে, প্রতিমার মেয়েদের অণিমার মেয়েদের মত জামা হইবে। সমরের মেয়ের একটা জামা হইবে!

গোবিন্দ বলিতেছিল—দেখুন, ফ্রক-স্যুটই হবে, তবে গলাটা হবে. অণিমাদির মেয়ের—মানে, এই জামাটার মত রাউণ্ডশেপ, আর, এর হাতটা আছে হাফ—এই হাতটা হবে প্রতিমাদির মেয়ের জামার মত ফুল হাতা। তবে কাঁধের কাছটা একটু ফুলো থাকবে।

ভোলনাথবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—তুমি করছ কি ?

—প্রতিমাদি, অণিমাদি—

—আঃ—গোপাল কোথায় ?

—সে গেছে দোকানে ; শ্যামাদির জন্যে মেজবৌদির কাপড় দেখিয়ে একখানা কাপড় আনতে।

গত্যন্তর না দেখিয়া ভোলানাথবাবু নিজেই ছুটিলেন স্টেশনে।

ঘরের মধ্যে রাণু বধূবেশে তখনও মাকে বলিতেছিল—আমায় একটা ফারকোট কিনে দিলে না মা ?

রাণুর মা এবার বিরক্ত হইয়া বলিল—দিয়ে থুয়ে কখন ত' মেয়ের মন পাওয়া যায় না সংসারে !

—কই কই ? ও-বাড়ীর দাদি ঘরে ঢুকিলেন একরাশ জিনিস লইয়া। রাণুর মা একটি ছেলেকে ডাকিয়া বলিল—ওরে, ডাক্ ত' সব—ঠাকুমাকে, খুড়ীমাকে, সক্কলকে। বল্, দাদি কত জিনিস দিয়েছেন, দেখবেন আসুন !

দেখিতে দেখিতে ঘরে ভিড় জমিয়া গেল।

বিবাহ হইয়া গেল।

বাসরে কলরব উঠিতেছিল। রাণু ছিল নীরবে বসিয়া। দাদি ঐ মোটা শরীর লইয়া শুধু গান নয়, নাচও আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। বাঃ, প্রতিমাদিদির মুক্তার কলারটা কি সুন্দর মানাইয়াছে—বেনারসীখানাও কি সুন্দর ! অণিমাদিদি হাতে বোধ হয় বারোগাছা করিয়া চুড়ি

পরিয়াছেন—আলোর ছটায় ভাল করিয়া চাওয়া যায় না! রাণু আপন হাতের কয়গাছি মিনমিনে চুড়ি নাড়িতে নাড়িতে কি যেন ভাবে। তাহার মনের আনন্দ উদাস হইয়া উঠিল।

বিবাহের পরদিন বরকন্যা-বিদায়ের সময় রাণু কিন্তু অবাক হইয়া গেল। কনকাঞ্জলি দিতে দিতে রাণুর মুখের পানে চাহিয়া ভোলানাথবাবু ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন —রাণুর মা! রাণুর চোখেও জল আসিল। সে অবাক হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, শুধু বাবা নয়—ঠাকুমা কাঁদিতেছেন, ওই যে, মাও কাঁদিতেছেন, প্রতিমাদি, অণিমাদি, শ্যামাদি সবার চোখে জল! কাকাও কাঁদিতেছেন! ওই যে স্বকুমারী-ঠাকুমার চোখেও জল। তাহার জন্য—শুধু তাহারই জন্য সকলে কাঁদিয়া সারা! এমন মুহূর্ত্ত রাণুর জীবনে কোনদিন আসে নাই—তৃপ্তির গৌরবে তাহার বুক ভরিয়া গেল; ফার-কোটের দুঃখ, আভরণের অভাবের বেদনা সমস্ত ঘুচিয়া গিয়াছে; সেমুহূর্ত্তে সত্যসত্যই সে রাজরাণীর মত মহিমময়ী, বন্দনীয়া হইয়া উঠিয়াছে। সকলকে ছাড়িয়া সে আজ পর হইতে চলিয়াছে। যে বেদনা তাহার মনের মধ্যে একটি বিন্দুর মত টলমল করিতেছিল, সেই বেদনা অকস্মাৎ যেন সমুদ্রের মত বিশাল হইয়া উঠিল; চোখের জলে তাহার চন্দনচর্চ্চিত মুখ ভাসিয়া গেল।

গদ্য-কবিতা

কানের দুল দুটো দুলে ওঠে কথা বলতে গিয়ে; অর্ধ সমাপ্ত আবদার রস-গদ্‌গদ্‌ ভঙ্গীতে মুখের মধ্যেই মিলিয়ে যায়।

লীলা প্রথমে স্বামীর গলাটা জড়িয়ে ধরলে—আদরিণীরা যেমন পুরুষের স্নেহপ্রবণতার সুযোগে গ্রীবা দুলিয়ে অভিমান জানায়।

বললে, বেশ করেছি, খুব করেছি—

প্রণয়-প্রশ্রয়িনীদের অস্ত্র কণ্ঠে আর চোখের কোণে। তার রসঢালা অধরের দিকে চেয়ে হরিচরণ বললে, গয়না বাঁধা দিয়ে সিনেমা দেখা? কি সর্ব্বনাশ।

আবার দেখবো, ফের দেখবো।—এই ব'লে সভয়ে লীলা স্বামীর গলা ছেড়ে উঠে গেল এবং পিছন দিক থেকে তার পিঠের উপরে মুখ লুকিয়ে বললে, একি আমার দোষ? নিয়ে যাওনা কেন? কেন তুমি বাড়ী থাকো না?

হরিচরণ বললে, আচ্ছা বেশ, রোজ যেয়ো।

তার গলার আওয়াজটাই যথেষ্ট। পলকের মধ্যেই লীলার উত্তেজনা ক'মে আসে। সে ঘুরে এসে স্বামীর হাত দু'খানা টেনে নিয়ে নিজের গলায় জড়ায়। বলে,—তুমি বলোনি কেন যে, গয়না বাঁধা দিয়ে সিনেমায় যাওয়া অন্যায়।

এবং তারপরে, বলা-বাহুল্য, স্বামীস্ত্রীর বিবাদ ওইখানেই মিটমাট হয়ে যায়। মিটমাট না ক'রেই বা উপায় কি। আজ তিন বছর হোলো তাদের বিয়ে হয়েচে। লীলার বয়স পনেরো থেকে আঠারোয় এসে দাঁড়ালো, কিন্তু জ্ঞানমার্গে তার উন্নতি সুদূরপরাহত। সে ভালো ক'রে কাপড় পরতে শেখেনি, সাজতে জানে না, না জানে স্বামীর সুখদুঃখের সঙ্গী হ'তে। তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ।

বাড়ীতে স্ত্রীর কাছে মোতায়েন থাকা হরিচরণের পক্ষে সম্ভব নয়। তার অনেক কাজ, যন্ত্রপাতির কাজ-কারবারে তার খাটুনি আজকাল অনেক বেড়ে গেছে। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা—তার কাজের কামাই নেই, অবকাশ বড় কম।

সে বললে, আজ আমি কোথায় কোথায় গিয়েছি, কি কি করেছি শুনবে?

না আমি শুনবো না, কিছুতেই শুনবো না—এই ব'লে লীলা রাগ ক'রে বিছানায় গিয়ে উঠলো। স্বামী যাতে আর কিছুতেই তার মুখ দেখতে না পায় এজন্যে মুখের উপর মুড়ি দিয়ে সে শক্ত হয়ে শুয়ে রইল। আর একটুও বাক্যালাপ সে করবে না।

হরিচরণের রাগ হয় না। রাগ করবার যোগ্য স্ত্রী তার নয়। এই অর্বাচীন নির্বোধ মেয়েটিকে সে দীর্ঘ তিনবছর চালিয়ে নিয়ে এলো। তার

স্নেহের প্রশ্রয়ের মধ্যে ওর কত চপলতা, কত কী অবাধ্যতা, তার সীমা নেই, স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে সে একটু হাসলো, আর কিছু বললে না।

আলোটার কাছে গিয়ে হরিচরণ তার জামার পকেট থেকে এক তাড়া কাগজপত্র বার করলে। আজ তার জমাখরচের হিসেব অনেক বেশি। এক টন্ স্থুরকির দাম, ছ'টাকা সাড়ে পনেরো আনা। তিনশো একান্ন মন স্থুরকির দাম আজ রাত্রে তাকে ক'শে বার করতেই হবে। কাল সকালে মুখার্জি কোম্পানীতে জয়েন্টের টাকা হিসেব ক'রে জমা দেওয়া চাই। ওদিকে সেই জয়রামপুর ফার্ম থেকে ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান্ সেই জল পাম্প্ করার যন্ত্রটার ড্রইং পাঠিয়েছে, সেটা নিয়ে কাল বাজারে ঘোরা চাই,—বাস্তবিক, তার একটুও নিঃশ্বাস নেবার সময় নেই!

একবার মুখ ফিরিয়ে সে ডাকলে, লীলা? শুন্‌ছ?

লীলা সাড়া দিল না।

হরিচরণ মিনতি ক'রে বললে, দীনু মিস্ত্রির কাগজগুলো সেই যে রাখতে দিয়েছিলুম তোমার কাছে—লক্ষ্মীটি, দাওনা, তার হিসেবটা আজ আজ চুকিয়ে ফেলতেই হবে। ভারি তাগাদা দিচ্ছে। ও লীলা?

লীলা সাড়া দিল না, অতএব নিরুপায় হয়ে হরিচরণকে তিনশো একান্ন মন স্থুরকির মরুভূমিতে হাতড়ে চল্‌তে হোলো।

নিচে থেকে পিসিমা এক সময়ে খাবার জন্য ডাক দিলেন। ঠাকুর খাবার বেড়ে দিয়েছে। হরিচরণ কাগজ-পত্র ছড়িয়ে রেখে উঠে নিচে চলে যায়। হিসেবগুলো তার মাথার ভিতর ঘুরপাক খেতে থাকে।

আহারাদি সেরে উপরে উঠে এসে সে দেখলে, লীলা অগাধ নিদ্রায় অভিভূত। স্বামীর পক্ষে প্রশ্ন করা উচিত স্ত্রীর আহার হয়েছে কিনা।

নবজীবনের প্রান্তে

হরিচরণের সে কর্তব্য মনেই এলো না। রাত অনেক হয়েছে বৈ কি, বারোটা বাজে, চোখে তার ঘুমের আবেশ জড়িয়ে এসেছে। এখন আবার হিসাবপত্র নিয়ে বস্‌লে বাকি রাতটুকু পুইয়ে যাবে। কাল সকালে উঠেই তার নতুন বাড়ীর কাজের তদারকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। খাটুনি অনেক। কিন্তু চোখের পাতায় ঘুম নেমেছে ঘন হয়ে।

দরজাটা বন্ধ করে আলোটা নিবিয়ে হরিচরণ বিছানায় এসে উঠল। লীলা ঘুমিয়েছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে, তারই একান্তে অল্প একটু-খানি জায়গা নিয়ে সেই নরম আর মধুর বিছানায় হরিচরণ কুণ্ঠিতভাবে শুয়ে পড়ে।

লীলা? ওগো—

লীলার সাড়া নেই। পরিশ্রম একটু হয়েছে বৈ কি! সিনেমায় যাওয়া আসা, সংসারের কাজে সারাদিন ছুটোছুটি,—স্ত্রীকে সে আর ডাকলে না। জান্‌লার বাইরে অন্ধ শ্রাবণের বর্ষণ-মুখরতা অনেকক্ষণ থেকেই চলছে, পথের কোন্ প্রান্ত থেকে একটুখানি জলে-ভেজা পাণ্ডুর আলো এসে পড়েছে খাটের বাজুর উপর। শ্রাবণের একটা তৃষ্ণার্ত আত্মা বাইরে যেন বায়ুর বেগে নিশ্বাস ফেলে চলেছে। হরিচরণ স্থির হয়ে শুয়ে রইল। কিন্তু আলো জ্বালা থাকলে দেখা যেতো তার পাশে যে মেয়েটি আপাদমস্তক আবৃত ক'রে নিঃশব্দে প'ড়ে রয়েছে তার আল্‌তা-পরা পা দুখানি একটি অপরটির গা ঘষছে—ঋতু সমাগমে হরিণ যেমন হরিণীর গাত্র লেহন করে। কাছে টেনে নেবার প্রতীক্ষায় নারী জেগে ছিল।

নবজীবনের প্রান্তে

দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে? ওই যে আমাদের নতুন বাড়ী। চিড়িতনের ফোকর—মিঠে গোলাপী রং মানিয়েছে দেওয়ালে,—ও কি, কী ভাবছো?—হরিচরণ উৎসুক হয়ে স্ত্রীর দিকে মুখ ফেরাল।

চলন্ত মোটরে ব'সে বাইরের দিকে চেয়ে লীলা বললে, কিচ্ছু না।

হরিচরণ চোখের তারায় উল্লাসের ঝঙ্কার তুলে বললে, এমন প্ল্যানের বাড়ী কলকাতায় একটিও নেই, রবি ঠাকুরের শ্যামলীকেও হার মানায়! জানলা দেখবে কচি কলাপাতা রং, ইট, চূণ, সুরকির একটা অদ্ভুত স্বপ্ন, বর্ণ পরিচয়ের অক্ষরগুলো একত্র ক'রে যেন একটা গীতিকবিতা।

আঃ—লীলা চোখ রাঙিয়ে উঠলো—এক কথা একশো বার। যাবো না আমি তোমার সঙ্গে।

হরিচরণ যেন ফুৎকারে নিভে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখলে তাদের ট্যাক্সি নতুন বাড়ির ধারে এসে থেমেছে।

দু'জনে নামতেই লোকজন ঘিরে এসে দাঁড়ালো। কেউ দালাল, কেউ মিস্ত্রী, কেউ সিমেণ্টওয়ালা। হরিচরণ বললে, বাড়ী ত প্রায় শেষ, আনলুম আমার স্ত্রীকে দেখাতে—বুঝলেন না, মেয়েদের চোখই আলাদা। পুরুষ মানুষ আর বাড়ীতে থাকে কতটুকু, বাড়ী ত মেয়েদেরই জন্য। কাল আবার পিসিমাকে এনে দেখাবো। এসো, এই দিক দিয়ে—ইয়া, আরে, এ কি করেছেন সরকার মশাই, দালানের খিলেন খুলিয়েছেন? জ'মে গেছে বুঝি? কাল রাতে যে বৃষ্টি, ঘুমের ঘোরে ভাবলুম বুঝি চূণের ঘরে জল ঢুক্‌ছে!

মেঘের মতো মুখ ক'রে লীলা প্রায় সমস্ত বাড়ীটা ঘুরে ঘুরে স্বামীর সঙ্গে দেখতে লাগলো। বাঁশ, কাঠ, চূণ, সুরকি ইঁটের কুচি, দড়ি,

করোগেটের টুক্‌রো—চারিদিক একাকার। রং আর ছুতোরের কাজ চলছে। নতুন কাঁচা রঙের গন্ধে ঘরগুলো ভরো ভরো। খুশিতে হরিচরণের মুখখানা আরক্ত আভায় অলঙ্কৃত। এখানে একটা নতুন জীবনের পত্তন হবে। এখানকার কুমারী মৃত্তিকার পছন্দসই ফুলের বীজ বপন করা হবে। আগামী বসন্তে পুষ্প-বীথিকা। হরিচরণের হৃদ্‌পিণ্ডটা রক্তের তরঙ্গে নাচতে লাগলো!

এদিকে এসো লীলা, এ বারান্দায় দাঁড়ালে সমস্ত শহর,—দূ—রে চেয়ে দেখো মনুমেণ্টের চুড়ো—সে ব'লে চললো, দক্ষিণ দিকে নতুন আকাশের টুক্‌রো। বাথরুম্ দেখবে এসো।

লীলা তার পিছনে চললো মুখে রাশি-পরিমাণ বিরক্তি নিয়ে।

ওহে মিস্ত্রী, ইটালিয়ান্ টাইল্‌স্ আসেনি বুঝি? বাথ্ টাব্‌টা কাঁচের হবে মনে আছে ত? এই খানে ধারাযন্ত্র দেবো। অদ্ভুত গন্ধ ঘরটায়—না? এইটে সাবান তেল রাখার কুলুঙ্গী। জানলার ফ্রেমে রঙীন কাঁচ, প্রায় কাঁচের ঘর। বাথ্‌রুমে গান গাইতে বেশ লাগে, জলের শব্দে মিলে যায়!—হরিচরণ বললে, পছন্দ হয়েছে ত? হবেই জানা কথা

লীলা বললে, ফিরে চলো এবার।

সে কি, আরো কত যে দেখবার আছে। দাঁড়াও, অনেক কাজ,—ওরা সবাই অপেক্ষা করছে। হিসেবটা সেরে দিই—ওহে সরকার মশাই—

না, ফিরে চলো, আর আমি একটুও থাকবো না—লীলার ঝোঁকটা বেড়েই চললো, একটুও ভালো লাগছে না, এক্ষুনি চলো।

নবজীবনের প্রান্তে

বিস্মিত হয়ে হরিচরণ বললে, কী বলছ তুমি ?

থাকতে আমি পাচ্ছিনে। লীলা চেঁচিয়ে উঠলো—থাকো তুমি, আমি চ'লে যাই।

একা যাবে কোথায় ট্যাক্‌সিতে ? ছি কী হ'লে তুমি ?—হরিচরণ তার হাত চেপে ধরলো। লীলা মুখ তুলতেই দেখা গেল বড় জলের ফোঁটা তার দুই চোখে ভ'রে উঠেছে।

নূতন সিঁড়ির ধারে সরকার মশায়ের পয়ের শব্দ হ'তেই হরিচরণ স্ত্রীর হাত ছেড়ে দিলে। বললে, সরকার মশাই, আসছি আমি এখুনি এঁকে বাড়ী পৌছে দিয়ে—শরীর ত এঁর ভালো নয়। এসো।

স্বামীর পিছনে পিছনে নেমে এসে লীলা গাড়ীতে উঠলো। হরিচরণকে আবার এখুনি ফিরে আসতে হবে। জলের পাইপ কোথা দিয়ে আসবে দেখা দরকার। পাঁচিল মাপের কাজে তাকে না হ'লেই চলবে না। বাড়ীর নর্দমাগুলোর পথ সে এসে বুঝিয়ে দেবে। সে না থাকলে সিমেণ্টের হিসেব হবে না, ছুতোররা কাজে ফাঁকি দিচ্ছে—সে এসে কাজের হিসেব নেবে। চলন্ত মোটরে স্থির হয়ে ব'সে হরিচরণ কাজের কথাই ভাবতে লাগলো।

লীলা একটু কাছে স'রে এলো। তার হাতের ওপর হেলান দিয়ে মুখ তুলে বললে, আর তোমাকে আমি এখানে আসতে দেবো না।

মুখ ফিরিয়ে হরিচরণ বললে, কোথায় ? নতুন বাড়ীতে !

হ্যাঁ। তুমি আসতে পাবে না।—এই ব'লে লীলা তার উৎসুক চিক্কণ অধর তুলে ধরলে।

নবজীবনের প্রান্তে

আমি না এলে কাজকর্ম দেখবে কে ?—হরিচরণ বললে, সিঁড়ির রেলিংগুলো তোমার কেমন লাগলো ? বেশ নতুত ধরণের হয়েছে, নয় ? জানো ছ'টাকা তের আনা ক'রে ওদের হন্দর। আজকাল ভারি আক্রা।

ব্যর্থ মুখ লীলা ফিরিয়ে নিলে। মোটর প্রায় বাড়ীর কাছাকাছি এসে গেছে। সোজা হয়ে বসে সে বললে, আজ তবে আমাকে নিয়ে চলো সেখানে ?

কোথায় ?

সেই যে খড়দার গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলেছিলে ?

বা-রে, বেশ মেয়ে ত, তুমি ? হরিচরণ বললে, এটা বুঝি বেড়ানো হলো না ? তুমিও বেড়ালে, আমারও কাজ হোলো—এই ত' বেশ !

মুখখানা অন্ধকার ক'রে লীলা চুপ ক'রে রইলো।

সেদিন ফিরে এসে সমস্ত দিন হরিচরণ তার নিত্যকর্মের জটিল জালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল। তার সমস্ত চিন্তা আর কল্পনার ধারা তার এই নতুন সৃষ্টির সঙ্গমে এসে মিলেছে। আর কোনদিকে তার মনের গতি ঘুরিয়ে দেবার অবসর নেই, এ যেন একটা ভয়ানক নেশা।

বাড়ী ফিরতে তার একটু বেশী রাত্রি হোলো বৈ কি, এত দেরি তার সহসা হয় না। স্নান ক'রে কাপড় চোপড় ছেড়ে সে এসে খেতে বসলো। পিসিমা খাবার রেখে বসেছিলেন। আশেপাশে লীলাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না—সকালের সেই অজস্র অভিমান সে বোধ করি ভুলতে পারেনি। কিন্তু অভিমান ভাঙ্গাবার সময় হরিচরণের নয়। সে মুখ বুজে খেতে লাগলো।

নবজীবনের প্রান্তে

পিসিমা রুষ্ট মুখে হরিচরণকে বাতাস করতে করতে এক সময় বললেন, এত অবাধ্য হ'লে ত' সংসার চলে না, হরিচরণ।

কি হোলো, পিসিমা?

বৌমার কথা বলছি। সারাদিন খেটেখুটে তুই বাড়ী এলি, আর সে নিজের মতে চ'লে গেল।

কোথায় সে?

সে বাড়ীতে নেই বাছা।

সে বাড়ীতে নেই! মানে?—হরিচরণ মুখ তুললে।

পিসিমা বললেন,সেই যে তুই রেখে গেলি,তার ঘণ্টাখানেকের পরেই সে একলা চ'লে গেল, খেলে না, নাইলে না। জিজ্ঞেস করলুম, বৌমা, কোথায় যাচ্ছো গো। ব'লে গেল, দিদির বাড়ী? জানিনে বাছা এখনকার মেয়েদের কাণ্ড।

আহারাদি ক'রে হরিচরণ উপরে উঠে এলো। ঘরের মধ্যে একরাশ জামা-কাপড় ছড়ানো। বোঝা গেল, সবচেয়ে যে শাড়ী আর জামা তার পছন্দ সেইগুলি প'রে সে গেছে। অন্যান্য জামা, কাপড়, আণ্ডারওয়ার, ব্লাউজ—সমস্তগুলি ঘরময় বিক্ষিপ্ত, ধূলিধূসরিত। সমস্ত ঘরটা সুগন্ধি দ্রব্য আর পাউডারের স্তিমিত গন্ধে ভরোভরো। হরিচরণ সারাদিনের পরিশ্রমের পরেও সেগুলি একে একে পাট ক'রে সুবিন্যস্ত অবস্থায় আলমারির মধ্যে সাজিয়ে রাখলো। তার ভয়ানক রাগ হোলো, কারণ এগুলি প্রয়োজন-মতো খুঁজে না পেলে সেই অবুঝ আর অনভিজ্ঞ মেয়েটি তার জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে।

নবজীবনের প্রান্তে

কিন্তু রাত্রি দশটা বাজে। স্বামীকে ছেড়ে কোথাও থাকবার মেয়ে সে নয়। সিনেমায় আজ সে যায়নি। হরিচরণের বলিষ্ঠ হাতখানার উপর মাথা রেখে না শুলে সেই মেয়ের ঘুম হয় না। দিদির বাড়ী সে কিছুতেই থাকবে না, কারণ দিদির সঙ্গে তার এক তিল বনিবনা নেই। তবে রাত্রে সে কোথায় গেল ?

অথচ আজ সময় নষ্ট করলে হরিচরণের চলবে না। সে গিয়ে বসলো টেব্‌লের ধারে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মধ্যে সে একাগ্র মনে সাঁতরে চললো। আজ তার হিসাবের সমস্ত কাজগুলো শেষ করা চাই ; এবং এইভাবে রাত প্রায় দেড়টা পর্যন্ত সমস্ত পারিপার্শ্বিক বিস্মৃত হয়ে সে হিসাবপত্রের অথৈ নদী সাঁতরে কুলে এসে উঠলো—তখন তার দুই চক্ষু নিদ্রার রসে টলটল করছে। একবার সে অনুপস্থিত লীলার প্রতি তার অসীম বিরক্তি প্রকাশ করবার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না, টলতে টলতে বিছানায় উঠে দু'মিনিটের মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হোলো।

অত রাত্রি জাগার পর সকালবেলা ঘুম ভাঙাতে হরিচরণের একটু দেরি হোলো অবশ্য। আড়ামোড়া খেয়ে একটু আলিস্যি ভাঙ্‌বার চেষ্টা করতেই সহসা সে চম্‌কে উঠলো। চোখ খুলে দেখলে লীলা তার পাশে অকাতরে ঘুমিয়ে রয়েছে। তার সেই ঘুমের মধ্যে, তার চোখে, মুখে ভ্রূরেখায় অকুণ্ঠ অসম্বৃত দেহবিস্তারে কোথাও এতটুকু সঙ্কোচ অথবা উদ্বেগ নেই। রাত্রে কখন্ সে ফিরে এসেছে হরিচরণ কিছুই জানে না। রুক্ষ চুলের রাশির অন্ধকারে চাঁদপানা মুখে তার সোহাগভরা নিদ্রা—নিদ্রায় আলুথালু।

কিন্তু নিদ্রিতা নারীর রূপমাধুরী নিঃশব্দে পান করার আগ্রহ হরিচরণের ছিল না, সে কঠিন কণ্ঠে বললে, পোড়ারমুখি, কাল সারাদিন কোথায় ছিলে শুনি?

লীলা জেগে উঠলো। রাত্রি জাগরণে রাঙা দুই হরিণীনয়ন। কিন্তু সে পলকের জন্য। তারপরই সে অতিশয় বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে আবার দিব্যি ঘুমোতে লাগলো।

হরিচরণ বললে, অমনি ক'রে চটকাচ্ছো, ভালো কাপড় জামাগুলো নষ্ট হয়ে গেল যে?

কিন্তু স্ত্রীর সাড়া পাওয়া গেল না। এর পরে হরিচরণ রাগ করবে কার উপর? অগত্যা বিছানা থেকে নেমে সে বাইরে গিয়ে ডাক দিলে, ঠাকুর চা দিয়ে যাও।

ঠাকুর চা আনবার আগে সে ঘরে এসে একবার স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গে গায়ের কাপড় টেনে টেনে ঢাকা দিলে। বললে, এমন বেপরোয়া ঘুম কোথায় শিখলে শুনি? নাও, ওঠো, ঠাকুর চা আন্‌ছে।

ক্লান্ত দেহে লীলা এবার উঠে বসলো। হরিচরণ প্রশ্ন করলে, কাল কোথায় ছিলে? রাত্রে ফিরলে কখন্?

সাড়ে তিনটের সময়।—লীলা বললে।

হরিচরণ বললে, একা?

না, জামাইবাবুর ছোট ভাই ছিল সঙ্গে।

কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

আঃ—লীলা বিরক্ত হয়ে বললে, বলছি যে ডায়মণ্ডহারবার গিয়েছিলুম বেড়াতে?

কই, একবারো বলোনি।

আচ্ছা বলিনি, হোলো ?

হরিচরণ বললে, সেখানে গিয়ে কি করলে ?

সেখানে ? লীলা এবার ফিক ক'রে হেসে ফেললে, দোল্‌না আছে, তাইতে দুলছিলুম দুজনে। জানো জামাই বাবুর ছোট ভায়ের গায়ে কী জোর। উঃ—আমাকে যা দোলা দিতে লাগলো। আমিও খুব ক'রে তার দোল্‌না ঠেলছিলুম।

আর কে গিয়েছিল তোমাদের সঙ্গে ?—হরিচরণ প্রশ্ন করলে। কিন্তু উত্তর দেবার আগে ঠাকুর দু'পেয়ালা চা এনে হাজির করলে।

মুখ ধুয়ে এসে লীলা গুছিয়ে বসলো। চায়ের পেয়ালা হাতের কাছে টেনে নিয়ে দীর্ঘ একটা ভূমিকা ক'রে তার গতদিনের ভ্রমণকাহিনী আনুপূর্বিক আরম্ভ করলে। তার দিদির দেবর কেমন ভালো ছেলে, কেমন তার সুন্দর চেহারা, কতখানি গায়ে জোর,—এই দিয়ে তার কাহিনী সুরু। তারা দু'জনে সারাদিন মোটর চ'ড়ে বেড়িয়েছে, আউট-রাম ঘাটের হোটেলে চা খেয়েছে, খিদিরপুরে ডক দেখেছে, তারপর গেছে ডায়মণ্ডহারবার। সেখানে চড়িভাতি ক'রে আহার সাঙ্গ করতেই প্রায় রাত বারোটা হয়ে গেল। জামাইবাবুর ছোটভায়ের মতন এমন মধুর স্বভাবের যুবক সে আর দেখেনি।

তারপর ?—হরিচরণ প্রশ্ন করলে।

তারপর আমাকে নীরেন এসে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌছে দিয়ে গেল !

বিদায় সম্ভাষণটা কেমন হোলো ?

ক্ষণেকের জন্য লীলা স্বামীর মুখের দিকে তাকালো। তারপর উঠে গিয়ে তার পিঠের উপর মুখ খানা ঘ'ষে বললে, তুমি বুঝি রাগ করলে? রাগ করবে জানলে আমি—

নীরেন কী বললে শুনি?

বলব না আমি যাও!

শিগগির বলো বলছি?—হরিচরণ ধমক দিলে কৃত্রিম কণ্ঠে।

স্বামীর মুখের উপর হাতখানা বুলিয়ে লীলা বললে, আমাকে দেখতে খুব ভালো, তাই বললে। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমার একটা কথা রাখবে বলো?

কি কথা?

আগে বলো রাখবে কি না?

হরিচরণ বললে, রাখবার মতন যদি হয়—

খুব রাখবার মতন।—লীলা আদর-জড়িত কণ্ঠে বললে, কিছু টাকা আমাকে দাও।

টাকা? কেন বলো ত?

নীরেনকে আমি দেবো। তার কিছু হাতখরচ নেই, তা জানো?

হরিচরণ স্তব্ধ বিস্ময়ে চুপ ক'রে রইলো। লীলা পুনরায় বললে, কাল আবার নীরেন আসবে,—আমরা কিন্তু কাল আর্ট একজিবিশন্ দেখতে যাবো, তা ব'লে রাখছি। বেশি না, দশটা টাকা দিয়ো লক্ষ্মীটি,—কেমন?

নিচে থেকে কে যেন বাইরের লোক হরিচরণকে ডাক দিলে। সে ওঠবার চেষ্টা করতেই লীলা তাকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, কিছুতেই শুনবো না আমি। বলো দেবে?

নবজীবনের প্রান্তে

রাগ ক'রে হরিচরণ বললে, আমি টাকা দোবো আর সেই টাকা নিয়ে তুমি—

আমি যে কথা দিয়েছি নীরেনকে।

পরপুরুষের সঙ্গে তুমি বেড়িয়ে বেড়াতে চাও?

সহজ সরল দৃষ্টিতে লীলা স্বামীর দিকে তাকালো। অবাক হয়ে বললে, পর কেন হবে? সে ত জামাইবাবুর ভাই?

নিচে থেকে আবার ডাক এলো। ব্যস্ত হয়ে হরিচরণ বললে, আচ্ছা, আজ ত' আর নয়। সাবধান, কাগজপত্র ছড়ানো রইলো, যেন হাত দিয়ো না। আসছি আমি।—এই ব'লে সে জামাটা গায়ে দিয়ে নিচে নেমে গেল। গেল বটে কিন্তু সে-বেলায় হরিচরণ আর ফিরে এলো না। ইঁটওয়ালার পাল্লায় প'ড়ে সারাটা দিন মিস্ত্রি-মজুরদের আন্দোলনে সে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে রইলো। স্ত্রীর কথা সে ভুলেই গেল।

রাগে দুঃখে অভিমানে লীলা সমস্ত দিন বিষধর সর্পিনীর মতো এদিক ওদিক ঘুরে বেডাতে লাগলো, তারপর এক সময় নিরুপায় হয়ে সে ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ করে দিলে। পিসিমা এসে ডাকাডাকি করলেন কিন্তু সে কিছুতেই সাড়া দিল না। বন্ধ ঘরের মধ্যে নিঃসাড় হয়ে প'ড়ে রইল।

হরিচরণ যখন ফিরলো তখন সন্ধ্যা সাতটা। পিসিমা তীব্রকণ্ঠে সমস্ত ঘটনা তার কাছে বিবৃত করলেন। অনেকদিন পরে আজ সহসা হরিচরণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। রাগে অন্ধ হয়ে সে উপরে উঠে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললে, খোলো শিগগির দরজা।

নবজীবনের প্রান্তে

স্বামীর গলার আওয়াজ পেয়ে তখনই লীলা দরজা খুলে দিলে। হরিচরণ ভিতরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বাললো, তারপর বললে, কেন তোমার এই স্বেচ্ছাচার দিন দিন ?

হাসিমুখে লীলা বললে, কেমন জব্দ ?

তোমার এই হিষ্টিরিয়ার ভূত আমি ছাড়াতে জানি তা জানো ?—বলতে বলতেই হরিচরণের দৃষ্টি পড়লো ঘরের এক কোণে। সচকিত হয়ে সে বললে, ঘরের মধ্যে অত কাগজের ছাই কেন ?

লীলা রাগ ক'রে বললে, তোমার সব কাগজপত্র আমি পুড়িয়ে ফেলেছি।

অ্যাঁ ?—এই ব'লে হরিচরণ সেই ছাইগুলোর উপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বললে, সর্বনাশি, বাড়ির সব কাগজপত্র আর হিসেবের যা কিছু এর মধ্যে,—কী করলে তুমি ?—হতাশ হয়ে ব'সে পড়ে সে স্তব্ধ হয়ে রইলো।

লীলা তার কাছে স'রে এলো। তারপর স্বামীর গায়ের উপর গা ঘষে দাঁড়িয়ে সহজ সুরে বললে, বেশ করেছি। কেন তখন এই আসছি ব'লে চলে গেলে ? কেন এলে না সারাদিন ? খুব করেছি, বেশ করেছি—এই ব'লে সে হরিচরণের জামাটা খুলে দিতে লাগল নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে।

অপূরণীয় ক্ষতিতে সর্বস্বান্ত হরিচরণ সহসা স্বভাব-বিরুদ্ধ উত্তেজনায় এক সময় স্ত্রীকে আক্রমণ করলে। তার চুলের মুঠি ধ'রে পাকিয়ে রোষ-কষায়িত চক্ষে রুদ্ধ কঠিন স্বরে বললে, হতভাগি, কেন এই সর্বনাশ করলি?

কিন্তু লীলা আধুনিক মেয়ে নয়। শান্তভাবে সে তার দুই নিটোল নগ্নবাহু ছাড়িয়ে স্বামীকে ঘিরে ধরলো। তারপর একটি অতি উচ্চমার্গের

দার্শনিক বক্তৃতা ফেঁদে বললে, আমাকে ছেড়ে তুমি অন্য দিকে মন দাও কেন? কেন তোমার চোখ থাকে বাইরের দিকে? কেন তোমার ঝোঁক ইঁটপাটকেলের ওপর?

দাঁত দিয়ে দাঁত চেপে হরিচরণ বললে, তবে কী চাস তুই?

অশ্রু টলোটলো চক্ষে লীলা হাসলো; তারপর জোর ক'রে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে সিঁদুর-মাখানো মাথা বুকের কাছে ঘ'ষে গলার কাছটা লালাসিক্ত ক'রে দিয়ে রসগদগদ কণ্ঠে বললে, আমি চাই তোমাকে।

রাত্রির রোমান্স

বধু ডাকিল—ঘুমুচ্ছ?

মনোময় পাশ ফিরিয়া শুইল এবং বলিল—উঁহু—

বধু কহিল—বালিশ কোথায়? অন্ধকারে দেখিতে পাচ্ছি না ত! হ্যাঁগো, আমার বালিশ কোথায় লুকিয়ে রাখলে? না—এই যে পেয়েছি। বলিয়া আন্দাজি বালিশ খুঁজিয়া লইয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িল।

নব জীবনের প্রান্তে

মনোময় বলিয়া উঠিল—আঃ ঘাড়ের উপর শুলে কেন? সরে গিয়ে জায়গায় শোও—

বধূ বলিল—সর্ব্বনাশ! গায়ের উপর শুয়েছি নাকি? পিদ্দিমটা নিভে গেল, অন্ধকারে কিছু বুঝতে পারি নি। ভাগ্যিস কথা কইলে—

কিন্তু কথা যদি মোটে না-ই কহিত তা হইলেও মনোময়ের অস্থিসার দেহটাকে তুলার বালিশ বলিয়া ভুল করা কাহারও উচিত নয়।

এবারে শুইয়া পড়িয়া বধূ চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু কতক্ষণ! একা-একাই কথা চলিতে লাগিল—ওঃ কী গরম! বৃষ্টি বাদলার নাম-গন্ধ নেই, গরমে সিদ্ধ করে মারছে। তার উপর দু-দুটো উনুনে যেন রাবণের চিতে! সেই বেলা থাকতে রান্নাঘরে ঢুকেছি আর এখন বেরিয়ে আসা। ঘরে একটা জানালাও নেই।—ওগো ও কর্ত্তা,—ও ছোটবাবু, তোমরা রান্নাঘরে একটা জানালা করে দাও না কেন? এইবার করে দিও—বুঝলে?

তবু ছোটবাবু সাড়া দিল না। বোধকরি সে জানালা করিয়া দিবেই, তাই কথা কহিল না।

বধূর মুখের কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কয়টা মশা ভন-ভন করিয়া উঠিল। তবু যা হোক কথার দোসর জুটিল, ঐ মানুষটিকে আর ডাকিয়া ডাকিয়া খুন হইবার দরকার নাই। মশার সঙ্গেই আলাপন শুরু হইল। —দাঁড়া, কাল তোদের জব্দ করছি। সন্ধ্যাবেলা নারকেলের খোসার আগুন করে আচ্ছা করে ধুনো দেব, দেখি ঘরে থাকিস কি করে? খানিক জোরে জোরে পাখা করিতে লাগিল। তারপর মনোময়ের গায়ে

নাড়া দিয়া বলিল—ঘুমুচ্ছ কি করে? মশায় কামড়ায় না? সরে এস একটু, মশারি ফেলি—

এখানে বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে ঘুম সম্বন্ধে মনোময়ের বিশেষ-প্রকার নিপুণতা আছে। মশা ক্ষুদ্র প্রাণী, কামড়াইয়া কি করিবে? ঘুম যদি সত্যসত্যই আসিয়া থাকে, সুন্দরবনের বাঘে কামড়াইলেও ভাঙিবে না।

বধূ মশারি ফেলিল। মনোময়ের পাশটা গুঁজিয়া দিবার জন্য গায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। খাটের একেবারে কিনার ঘেঁষিয়া শুইয়াছে মনোময়। বধূ তাহার হাতখানা সরাইয়া দিল, যেখানে সরাইয়া রাখিল, সেইখানেই এলাইয়া রহিল। পুনরায় তুলিয়া লইয়া সেই হাতখানা নিজের হাতের উপর রাখিল। তারপর মনোময়ের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—ঘুমুলে নাকি? ওগো শুনছ? এরি মধ্যে ঘুম!

মনোময় নড়িয়া চড়িয়া পাশবালিশটা টানিয়া লইয়া বলিল—ঘুম কোথায় দেখলে? বল কি বলবে।

বধূ বলিল—এস খানিক গল্প করি, এত সকাল-সকাল ঘুমোয় না—

মনোময় কহিল—কর।

—কালকে আমি গল্প বলেছি, আজ তোমার পালা। সেই রকম কথা ছিল না?

—হুঁ—

—তবে?

মনোময় বলিল—তা হোক,—আজও তুমি বল ঊষা। কালকের শেষটা শোনা হয় নি—ঘুম এসেছিল।

নবজীবনের প্রান্তে

বধূর নাম উষা। বলিল—আজও তেমনি ঘুমুবে ত ?

মনোময় কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল—কক্ষনো না।

উষা কহিল—কিন্তু এখনি ত ঘুমুতে আরম্ভ করেছ, ঐ যে দেখছি—

মনোময় বলিল—দেখতে পাচ্ছ ? অন্ধকারে তোমার চোখ জ্বলে বুঝি—

উষা বলিল—জ্বলেই ত। সাত রাজার ধন মানিকের গল্প শোন নি—অজগর সাপ সেই মানিক মাথা থেকে নামিয়ে গোবরে লুকিয়ে রাখল, গোবর ফুঁড়েও তার আলো বেরোয়। তেমনি একজোড়া মানিক হচ্ছে আমার এই চোখ দুটো। চিনলে না ত !

মনোময় বলিল—কিন্তু মানিক ছাড়াও মেনি-বেরালের চোখ অন্ধকারে জ্বলে, বিজ্ঞানপাঠ পড়ে দেখো—

—কিন্তু এবার ত আর চোখ দিয়ে দেখা নয় মশাই, হাত দিয়ে ছোঁওয়া। অন্ধকারের মধ্যে উষা মনোময়ের চোখের উপর হাত বুলাইয়া দেখিল, উহা যথানিয়মে মুদ্রিত হইয়া আছে। ভারী রাগিয়া গেল।

—বেশ, ঘুমোও—খুব করে ঘুমোও—আমি জ্বালাতন করব না। বলিয়া সরিয়া গিয়া উল্টাদিকে মুখ করিয়া শুইল।

মনোময়ও সরিয়া আসিল, আসিয়া তাহার একখানা হাত ধরিল। বলিল—ফিরে শোও, অত রাগ করে না—এদিকে একবার ফিরেই দেখ ঘুমিয়েছি কি-না ! ফিরবে না ? আহা, যদি কথা না-ই বল মাথা নাড়তে কি বাধা ?

অপর পক্ষ নির্ব্বিকার। যেন ঘুম পাইয়াছে, তেমনি গভীর নিশ্বাস পড়িতেছে।

নবজীবনের প্রান্তে

মনোময় বলিল—ঘুমুলে নাকি? ও উষা, ঘুমিয়ে পড়েছ? তারও পরীক্ষা আছে, সত্যিসত্যি যদি ঘুমিয়ে থাক 'হ্যাঁ'—বলে জবাব দাও।

এবার উষা কথা কহিল।—খুব যা তা বুঝিয়ে যাচ্ছ!

মনোময় হাসিতে হাসিতে বলিল—কি?

—এই যে বল্লে, ঘুম এসে থাকলে আমি 'হ্যাঁ'—বলে উত্তর দেব। ঘুম এলে বুঝি জ্ঞান থাকে! ভাবো, আমি বুঝিনে কিছু—আমি বোকা!

মনোময়ের দুর্গ্রহ। বলিয়া বসিল—বোকা নও ত কি! আমি বরাবর জেগেই আছি। তুমি চোখে হাত দিয়ে বললে, আমার চোখ বোজা—খোলা চোখে হাত দিলে বুজে যায় না কার? নিজের চোখে হাত দিয়ে দেখ না। আর, এই নিয়ে তুমি মিছামিছি রাগারাগি করলে—

উষাকে বোকা বলিলে ক্ষেপিয়া যায়। বলিল—আমি বোকা আছি, বেশ আছি—তোমার কি? বলিয়া জানালার ধারে একেবারে খাটের শেষপ্রান্তে চলিয়া গেল এবং তাহার ও মনোময়ের মধ্যেকার ফাঁকটুকুতে দুম-দুম করিয়া দুইটা পাশবালিশ ফেলিয়া দিল।

মনোময় হতাশভাবে বলিল—তা বেশ! মাঝে একেবারে ডবল পাঁচিল তুলে দিলে! খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—বেশ, আমার দোষ নেই—এবার নিশ্চিন্তে ঘুমান যাক।

যা বলিল তাই। হাই তুলিয়া সত্য-সত্যই পাশ ফিরিয়া শুইল।

তা হোক! উষাও পড়িয়া থাকিতে জানে। দুইজনেই চুপচাপ। যদি কেহ দেখিতে পাইত, ঠিক ভাবিত উহারা নিঃসাড়ে ঘুমাইতেছে।

খানিকপরে উষা উসখুস করিতে লাগিল। এমনও হইতে পারে, মনোময় সুযোগ পাইয়া এই ফাঁকে সত্য-সত্যই খানিকটা ঘুমাইয়া লইতেছে। ইহার পরীক্ষা করিতে কিন্তু বেশি বেগ পাইতে হয় না, গায়ে একটু সুড়সুড়ি দিলেই বোঝা যায়। ঘুম যদি ছলনা হয় মনোময় ঠিক লাফাইয়া উঠিবে, চুপ করিয়া সে কখনও সুড়সুড়ি হজম করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি সে না ঘুমাইয়া জাগিয়াই থাকে, এবং উষা গায়ে হাত দিবামাত্রই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠে! না—রাগ করিয়া শেষকালে অতখানি অপদস্থ হওয়া উচিত হইবে না।

ও-ঘরে বড়জায়ের ছেলে জাগিয়া উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষে তিনি দালানে আসিয়া ডাকিলেন—ছোট বউ, অ ছোট বউ, ঘুমুলি নাকি?

বার-দুই ডাকাডাকির পর উষা উঠিয়া গিয়া ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল—কি?

—তোর ঘরে স্পিরিটের বোতলটা আছে, বের করে দে—খোকার দুধ গরম করব।

বোতল বাহির করিয়া দিয়া তোষকের তলা হইতে দেশলাই লইয়া উষা প্রদীপ জ্বালিল। মধ্যেকার পাশবালিশের প্রাচীর তেমনি অটল হইয়া আছে। উষা যখন উঠিয়া গিয়াছিল, অন্তত সেই অবকাশে বালিশ দুইটির অন্তর্দ্ধান হওয়া উচিত ছিল। কাণ্ডখানা কি?

দীপ ধরিয়া মনোময়ের মুখের দিকে তাকাইতেই বুঝিতে পারিল, সে দিব্য অঘোরে ঘুমাইতেছে—ঘুম যে অকৃত্রিম, তাহাতে সন্দেহ নাই। দাম্পত্য জীবনের উপর উষার ধিক্কার জন্মিয়া গেল। পুরুষমানুষের

কেবল চিঠিতে চিঠিতেই ভালবাসা। ভালবাসা, না—ছাই! গরমের ছুটিতে ক'দিনের জন্য বাড়ি আসা হইয়াছে, একেবারে রাজ্যের ঘুম সঙ্গে করিয়া। আজ যখন কাজকর্ম্ম মিটাইয়া নিজেরা খাইয়া বাসনকোশন ও পিঁড়ি তুলিয়া এঘরে চলিয়া আসিতেছে—সেই সময় টুপ-টুপ করিয়া রান্নাঘরের পিছনে সিঁদুরে গাছের তলায় ক'টা আম পড়িল। সেজ-জা প্রস্তাব করিলেন—চলনা ছোট বউ, আম ক'টা কুড়িয়ে আনি। উষা বলিল—এখন থাকগে, সকালে কুড়ালেই হবে। সেজ-জা বলিলেন—সকালে কি আর থাকবে? রাত থাকতেই পাড়ার মেয়েগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। তখন বড়-জা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—না—না সেজবউ, ও ঘরে যাক। আর একজনের ওদিকে ঘুম হচ্ছে না, তা বোঝ? চল, তুমি আর আমি কুড়োইগে। আজ তোরও খুব ঘুম ধরেছে, না রে উষা? উষার লজ্জা করিতে লাগিল। জোর করিয়া বলিল—না, আমিও কুড়োতে যাব—এবং খুব উৎসাহের সহিত আম কুড়াইয়া বেড়াইয়াছিল। তখনই কিন্তু ছাঁৎ করিয়া মনে উঠিয়াছিল—জাগিয়া আছে ত?…

এবারে মনোময়ের ট্রাঙ্ক হইতে উষা ক'খানা উপন্যাস আবিষ্কার করিয়াছে। আজ রান্নাঘরে ভাত চড়াইয়া দিয়া তাহার একখানা লইয়া বসিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধন পালিত মহাশয়ের রচিত 'অদৃষ্টের পরিহাস'। বইখানা শেষ করিতে পারে নাই, ফেন উতলাইয়া উঠিল—অমনি সে পাতা মুড়িয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এখন এমন করিয়া একা শুইয়া কি করা যায়, ঘুম যে আসে না! কুলুঙ্গি হইতে বইখানা টানিয়া লইল।…খাসা লিখিয়াছে, পড়িতে পড়িতে উষা অবিলম্বে মগ্ন হইয়া গেল।

নবজীবনের প্রান্তে

উপন্যাসের নায়িকার নাম অধীরা। সম্প্রতি তাহার সঙ্গীন অবস্থা। নায়ক প্রণয়কুমারকে দস্যু ভৈরব-সর্দ্দার ইতিপূর্ব্বে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। অধীরা অনেক কৌশলে তাহার সন্ধান পাইয়া স্বয়ং দস্যুগৃহে গিয়াছিল, এখন রাত্রিবেলা ফিরিয়া আসিতেছে। বর্ণনাটা এই প্রকার—

একে অমাবস্যার রাত্রি, তায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সূচীভেদ্য অন্ধকার কেবল মধ্যে মধ্যে খদ্যোতকুল ঈষৎ জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছে। এই অন্ধকার-মগ্ন নিস্তব্ধ নিশীথে অরণ্যসমাকীর্ণ পথপ্রান্তে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে কে? পাঠকপাঠিকাগণ নিশ্চয়ই চিনিতে পারিয়াছেন,ইনি আমাদের সেই জমিদার-দুহিতা ষোড়শী সুন্দরী অধীরা। কণ্টকে পদযুগল রক্তাক্ত হইতেছে, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন সময়ে পশ্চাতে পদধ্বনি শ্রুত হইল। নিশ্চয়ই ভৈরব সর্দ্দারের অনুচর অনুসরণ করিতেছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া অধীরা আরও দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। পশ্চাতের পদধ্বনি ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। অধীরা অধিকতর বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুর্দ্দৈব বশত একটি বৃক্ষকাণ্ডে বাধিয়া পদস্খলন হইল। অনুসরণকারী তৎক্ষণাৎ বজ্রমুষ্টিতে তাহার হস্ত ধারণ করিল। অধীরা নানাপ্রকার অঙ্গ-সঞ্চালন করিয়া দস্যুহস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা পাইতে লাগিল। এই সময়ে চকিতে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল। দামিনীর তীব্র আলোকে দেখিতে পাইল অনুসরণকারী আর কেহ নহে, স্বয়ং প্রণয়কুমার। প্রণয়কুমার প্রশ্ন করিল—পাপীয়সী, এই গভীর রাত্রে নিবিড় অরণ্য মধ্যে কোথায় চলিয়াছিস্? আমি তোকে ভালবাসিয়া পরম বিশ্বাসে বক্ষে ধারণ

করিয়াছি, সেই বিশ্বাসের এই প্রতিদান ?—প্রণয়কুমার আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ মেঘগর্জ্জন দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তাহার কণ্ঠস্বর বিলুপ্ত করিয়া দিল এবং প্রবলবেগে বাত্যা ও ধারাবর্ষণ আরম্ভ হইল।

ঐ যে বাত্যা ও ধারাবর্ষণ শুরু হইল, ইহার পর পাতা তিনেক ধরিয়া আর তাহার বিরাম নাই। বর্ণনাগুলি বাদ দিয়া ঊষা পর পরিচ্ছেদে আসিল। সেখানেও বৃহৎ ব্যাপার। প্রণয়কুমার একাকী পঞ্চাশজন আততায়ীকে কিরূপ বিক্রম-সহকারে ধরাশায়ী করিয়া দস্যুগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার রোমাঞ্চকর বিবরণ কিন্তু ঊষার তাহাতে মন বসিল না। ষোড়শী সুন্দরী অধীরা নায়ককে খুঁজিতে গিয়া যে উল্টা উৎপত্তি ঘটাইয়া বসিল, সে কোথায় গেল ? প্রণয়কুমারের বিক্রমের বৃত্তান্ত পরে অবগত হইলেও চলিবে, ঊষা তাড়াতাড়ি একেবারে উপসংহারের পাতা খুলিল।

উপসংহারে আসিয়া অধীরার দেখা মিলিল, কিন্তু বেচারী তখন অন্তিম-শয্যায়। এমন সময়ে অতি আকস্মিক উপায়ে প্রণয়কুমার তথায় উপস্থিত হইল। স্থান সম্ভবত হিমালয় কিম্বা বিন্ধ্যাচলের একটি নিভৃত গুহা, কারণ ইতিপূর্ব্বে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গের বর্ণনা হইয়া গিয়াছে। ঊষা পড়িতে লাগিল—

অধীরা বলিল—আসিয়াছ হৃদয়বল্লভ ? আমি জানিতাম তুমি আসিবে। এই সংসারে ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। শেষ মূহূর্ত্তে বলিয়া যাই, আমি অবিশ্বাসিনী নই। ভৈরব-সর্দ্দারের গৃহে যে ছদ্মবেশী নবীন দস্যু তোমার শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া দিয়াছিল, সে এই দাসী ভিন্ন আর

কেহ নহে। হায়, আমাকে চিনিতে পার নাই। প্রণয়কুমার বক্ষে করাঘাত করিয়া কহিল—আমি কি দুরাত্মা! তোমার ন্যায় নিষ্পাপ সরলাকে তুষানলে দগ্ধ করিয়া হত্যা করিলাম। আমারই দুষ্কৃতিতে অন্য একটি অম্লান অনাঘ্রাত কুসুম কাল-কবলিত হইতে চলিয়াছে। এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে? অধীরা গদগদ কণ্ঠে কহিল—তোমার কোন দোষ নাই, সমস্তই অদৃষ্টের পরিহাস। আমার জন্য তুমি কত যন্ত্রণা সহিয়াছ। যাহা হউক এই পৃথিবী হইতে অভাগিনীর অদ্য চিরবিদায়। আবার জন্মান্তরে দেখা হইবে। যাই প্রাণেশ্বর। এই বলিয়া অধীরা ঝঞ্ঝাতাড়িত লতিকার ন্যায় প্রণয়কুমারের পদতলে পতিত হইল।

বই শেষ হইয়া গেল, তবু উষার ঘুম আর আসে না। ঐ বইয়ের কথাই ভাবিতে লাগিল। এ সংসারে পুণ্যের জয় পাপের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে আর ভুল নাই। অতবড় দাম্ভিক দুর্দ্ধর্ষ প্রণয়কুমার—তাহাকেও শেষকালে অধীরার শোকে রীতিমত বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া ভাসাইতে হইয়াছে। হাঁ—বই লিখিতে হয় ত লোকে যেন গোবর্দ্ধন পালিত মহাশয়ের মত করিয়া লেখে। বিছানার ও-পাশে তাকাইয়া মনোময়ের জন্য অনুকম্পায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। আজ ভাল করিয়া কথা কহিলে না, মাঝের বালিশ দুইটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া একটুখানি টানা-টানিও করিলে না, করিলে তোমার অপমান হইত—বেশ ঘুমাও, এমনিভাবে অবহেলা করিয়া নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাও—কিন্তু একদিন বুক চাপড়াইতে হইবে। উষার রাগ আরও ভয়ানক হইল, রাগের বশে কান্না পাইল। এমন করিয়া এক বিছানায় শুইয়া থাকা যায় না। উষা ভাবিতে লাগিল, এখনই একখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া দূরে—বহু-

দূরে একেবারে চিরদিনের মত চলিয়া গেলে হয়, কাল সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া তখন প্রণয়কুমারের মত হাহাকার করিতে হইবে।

আলো লইয়া টেবিলের ধারে গিয়া সে সত্যসত্যই চিঠি লিখিতে বসিল। কিন্তু ছত্র পাঁচেক লিখিয়া আর উৎসাহ পাইল না। কারণ, দূরে—বহুদূরে—চিরদিনের মত যে-স্থানে চলিয়া যাইতে হইবে, তাহার ঠিকানা জানা নাই। বাহিরে উঠানের পরপারে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় লিচুগাছটি ডালপালা মেলিয়া ঝাঁকড়া-চুল ডাইনি-বুড়ির মত দাঁড়াইয়া আছে। আর যাহাই হউক এই রাত্রিতে দরজার খিল খুলিয়া উহার তলা দিয়া কোথাও যাওয়া যাইবে না, ইহা নিশ্চিত। অতএব চিরদিনের মত দূরে—বহুদূরে যাইবার আপাতত তাড়াতাড়ি নাই। ঊষা পুনরায় বিছানায় শুইতে আসিল। আসিয়া দেখে, ইতিমধ্যে মনোময় জাগিয়া উঠিয়া মিটমিট করিয়া তাকাইয়া আছে। আলো নিবাইয়া গম্ভীরমুখে সে শুইয়া পড়িল।

হঠাৎ মনোময় ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিল—ঊষা, ঊষা—দেখছ—লিচু-গাছের ডালে কে যেন ধবধবে কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে, জানালা দিয়ে ঐ মগডালের দিকে তাকিয়ে দেখ না।

ঊষা বুঝিল, ইহা মিথ্যা কথা। সে বড় ভীতু বলিয়া মনোময় মিছামিছি ভয় দেখাইতেছে। তবু তাকাইয়া দেখিবার সাহস হইল না, সে চোখ বুজিল। কিন্তু চোখ বুজিয়া আরও মনে হইতে লাগিল, যেন সাদা কাপড় পরিয়া তাহার মেজ-জা একেবারে চোখের সামনে ঘুরঘুর করিয়া বেড়াইতেছেন। এই বাড়িতে মেজ-জা মারা গিয়াছেন, চৈত্রে চৈত্রে এক বৎসর হইয়া গিয়াছে, লিচুতলা দিয়া তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া

গিয়াছিল। উষা এমন করিয়া আর চোখ বুজিয়া থাকা বড় সুবিধাজনক বোধ করিল না। একবার ভাবিল—তাকাইয়া সন্দেহটা মিটাইয়া লওয়া যাক, মিছা কথা ত নিশ্চয়ই—ভূত না হাতী। সাহস করিয়া সে চোখ খুলিল, কিন্তু তাকাইয়া দেখা বড় সহজ কথা নয়। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ কট-কট করিয়া বাঁশবনের আওয়াজ আসিতেছে, তাকাইতে গিয়া কি দেখিয়া বসিবে তাহার ঠিক কি? মনোময়ের উপর আরও রাগ হইতে লাগিল। এতক্ষণ ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া জ্বালাইল, এখন জাগিয়া উঠিয়াও এমনি করে!

উঠিয়া তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিতে গেল, অমনি মনোময় খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া বসিল।—ও কি? কি হচ্ছে? এই গরমে জানালা বন্ধ করলে টিকব কি করে?

উষা বলিল—আমার শীত করছে—

মনোময় বলিল—বোশেখ মাসে শীত কি গো?

উষা বলিল—শীত করে না বুঝি! কখন থেকে একলা একলা খোলা হাওয়ায় পড়ে আছি। উষার গলার স্বর ভারী-ভারী।

মনোময় বলিল—আচ্ছা, আমি জানালার দিকে শুই—তুমি এই দিকে, কেমন!

উষা কহিল—থাক, থাক—আর দরদে কাজ নেই। দু'ফোঁটা চোখের জল গড়াইয়া আসিয়া মনোময়ের গায়ে পড়িল।

মনোময় শুনিল না—বালিশ দু'টাকে এক পাশে ফেলিয়া জোর করিয়া ধরিয়া উষাকে ডানদিকে শোয়াইয়া দিল। উষা আর নড়িল না, শুইয়া রহিল। একেবারে চুপচাপ।

খানিকক্ষণ পরে মনোময় ডাকিল—ওগো।

উষা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মনোময় জিজ্ঞাসা করিল—হাসছ কেন?

উষা বলিল—ঘুমুচ্ছিলে যে বড়!

মনোময় কহিল—তুমি যে রাগ করেছিলে বড়! এমন ভয় দেখিয়ে দিলাম—

উষা বলিল—না, তুমি বড্ড খারাপ। অমন ভয় আর দেখিও না। আমি সত্যি-সত্যি যেন দেখলাম, সাদা কাপড়-পরা মেজদিদির মত কে একজন। এখনো বুক কাঁপছে। তুমি সরে এস—বড্ড ভয় করে—

ভাব হইয়া গেল।

টং—

বড়জায়ের ঘরে ক্লক আছে, নিশুতি রাত্রে তাহার শব্দ আসিল।

মনোময় বলিল—ঐ একটা বাজল—আর বকে না, এবার ঘুমান যাক।

উষা বলিল—একবার আওয়াজ হলেই বুঝি একটা বাজবে। উঃ, কী বুদ্ধি তোমার! বাজল এই মোটে সাড়ে ন'টা।

মনোময় বলিল—সাড়ে ন'টা বেজে গেছে সাড়ে তিন ঘণ্টা আগে।

উষা বলিল—না হয় সাড়ে দশটা, তার বেশি কক্ষনো নয়।

মনোময় বলিল—তারও বেশি! আচ্ছা, দেশলাই জ্বাল, আমার হাত-ঘড়িটা দেখা যাক।

উষা তবু তর্ক ছাড়িল না।—তা বলে এর মধ্যে একটা বাজতেই পারে না—

নবজীবনের প্রান্তে

মনোময় বলিল—আলোটা জ্বাল আগে—

—জ্বালি। তুমি বাজি রাখ, হেরে গেলে আমায় কি দেবে?

মনোময় বলিল—যা দেব তা এখনো দিতে পারি—মুখাটা এদিকে সরাও—

ঊষা বলিল—যাও!

দেশলাই ধরাইয়া কুলুঙ্গির মধ্য হইতে হাত-ঘড়ি বাহির করিয়া দেখা গেল, কাহারও কথা সত্য নয়—একটা বাজে নাই, আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছে।

সর্ব্বনাশ! ঊষা শঙ্কিত হইয়া পড়িল। আবার খুব সকালে সকলের আগে উঠিতে হইবে। না হইলে রাধারাণী নামক এক ক্ষুদে ননদী আছে, সে উহাকে ক্ষেপাইয়া মারিবে।

বিছানাময় স্বচ্ছ জ্যোৎস্না। চাঁদ অনেক নামিয়া পড়িয়াছে। ঊষা হঠাৎ জাগিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। আগে বুঝিতে পারে নাই শেষে দেখিল তখনও ভোর হয় নাই। ভাল হইয়াছে, সেজ-জা ও রাধারাণীকে ডাকিয়া তুলিয়া রাত থাকিতে থাকিতেই ননদ-ভাজে মিলিয়া বাসন মাজা গোবর-ঝাঁট দেওয়া ও আর আর সকল কাজ সারিয়া রাখিবে, শাশুড়ী সকালে উঠিয়া দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া যাইবেন।

খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া আগের রাত্রির কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে ঊষার হাসি পাইল। বাপরে বাপ, মানুষটি এত ঘুমাইতে পারে, এখনো বেহুঁস! আগে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, মনোময় সত্যসত্যই ঘুমাইয়াছে কি-না, তারপর চুপি চুপি তাহার পায়ের গোড়ায়

প্রণাম করিল। এ কয়দিন রোজ সকালেই সে প্রণাম করে, কারণ গুরুজন ত! রাত্রে ঘুমের ঘোরে কতবার হয় ত গায়ে পা লাগে। তবে মনোময়কে চুরি করিয়া কাজটা করিতে হয়, সে জানিতে পারিলে ঠাট্টায় ঠাট্টায় অস্থির করিয়া তুলিবে।

মনোময়ও একটু পরে জাগিল। তাকাইয়া দেখে, পাশে উষা নাই। আকাশে তখনো চাঁদ আছে। কি কাজে হয় ত বাহিরে গিয়াছে, ঘুমের ঘোরে এমনি একটা যা তা ভাবিয়া সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে জাগিয়া উঠিয়াও পাশে উষাকে দেখিতে পাইল না। তাহাতে অবশ্য আশ্চর্য্য নাই, রোজ সকালেই উষা অনেক আগে উঠিয়া যায়। সেল্ফ্ হইতে দাঁতন লইতে গিয়া মনোময় দেখিল, টেবিলে প্যাডের উপর উষার হাতের লেখা চিঠি রহিয়াছে। রাত্রে বসিয়া বসিয়া কি লিখিতেছিল বটে! উষা লিখিয়াছে—

তোমার কোন দোষ নাই। তুমি আমার জন্য কতই যন্ত্রণা সহিয়াছ। তুমি কতই বিরক্ত হইয়াছ। এই পৃথিবী হইতে অভাগিনীর চিরবিদায়। জন্মান্তরে দেখা হইবে, যাই—

ইহার পর 'প্রাণেশ্বর' কথাটা লিখিয়া ভাল করিয়া কাটিয়া দিয়াছে। উষার পেটে পেটে যে এত তাহা মনোময় আগে জানিত না। এরূপ লিখিবার মানে কি? যাহা হউক সে বাহিরে গেল। অন্যদিন উষা এই সময়ে রান্নাঘরের দাওয়া নিকায়। আজ সেখানে নাই। এবার একটু শঙ্কা হইল। মেয়েরা ত হামেশাই আত্মহত্যা করিয়া বসে, যখন তখন শুনিতে পাওয়া যায়। খিড়কীর পুকুর বেশি দূর নয়, জলও গভীর। কিন্তু কি কারণে উষা যে এত বড় সংঘাতিক কাজ করিবে তাহা বুঝিতে

পারিল না। রাত্রে ঘুমের ঘোরে হয় ত সে কি বলিয়াছে! আনাচ-কানাচ সকল সন্দেহ জনক স্থান দেখিয়া আসিল, ঊষা কোথাও নেই। এমন মুশকিল যে একথা হঠাৎ মুখ ফুটিয়া কাহাকে জানাইতে লজ্জা করে। পোড়ারমুখী রাধারাণীটাও সকাল হইতে কোথায় বাহির হইয়াছে যে তাহাকে দু'টা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে। অবশেষে মনোময় বড়বৌদিদির ঘরে ঢুকিল, সে-ঘর ইতিপূর্ব্বেই একবার খুঁজিয়া দেখা হইয়াছে! বড়বধূ বিছানা তুলিতেছিলেন, বোধকরি মনোময়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, হাসিয়া বলিলেন—হারানিধি মিলল না? না ভাই, আমি চোর নই। ঘর ত আমাদের অজ্ঞাতে একবার দেখে গিয়েছ, এইবার বিছানাপত্তর ঝেড়ে ঝুড়ে দেখাচ্ছি—এর মধ্যে সেরে রাখি নি।

মনোময় বলিল—ঠাট্টার কথা নয় বৌদিদি, ছোট বউ কোথায় গেল বল দিকি? এই দেখ চিঠি—বলিয়া চিঠিখানা দেখাইল।

চিঠি পড়িয়া বড়বধূ গম্ভীর হইয়া গেলেন। বলিলেন—কি হয়েছিল বল ত—এ ত ভয়ের কথা!

মনোময় প্রতিধ্বনি করিল—সংঘাতিক ভয়ের কথা।

—তোমার দাদাকে বলি তবে?

বিমর্ষ মুখে মনোময় কহিল—না বলে উপায় কি?

বড়বধূ বলিলেন—ভাল করে খুঁজে টুজে দেখেছ ত?

—কোথাও বাকি রাখি নি, বৌদি!

—গোয়ালঘর সিঁদুরে-আঁবতলা?

—হুঁ।

—চিলেকোঠা?

—হুঁ।

—তোমার নিজের ঘরে? সিন্দুকের তলায় কি বাক্সের পাশে? দুষ্টুমি করে লুকিয়ে টুকিয়ে থাকতে পারে।

মনোময় বলিল—তা-ও দেখেছি, তন্নতন্ন করে দেখেছি।

বড়বধূ হতাশভাবে বলিলেন—তবে কি হবে? আচ্ছা, সিন্দুকের ভিতরে, বাক্সের ভিতরে? বলিতে বলিতে হাসিয়া ফেলিলেন।

মনোময় মাথা নাড়িয়া বলিল—বৌদি, ব্যাপার কিন্তু সহজ নয়—

বড়বধূ বলিলেন—নয়ই ত! আচ্ছা এস ত আমার সঙ্গে, আমি একটু দেখি—

বলিয়া মনোময়কে সঙ্গে করিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ ঘরটা দেখেছ?

এত সকালে রান্নাবান্না নাই—এ ঘরে আসিবে কি করিতে?

কিন্তু ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল, থালার উপর লঙ্কা ও লবণ সহযোগে কাঁচা আম জরান হইয়াছে। মুখোমুখি বসিয়া উষা ও রাধারাণী নিঃশব্দে মনোযোগের সহিত আহার করিতেছে। মনোময়কে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া উষা হাত গুটাইয়া লইল। রাধারাণী হাসিয়া উঠিল।

প্রত্যহের স্পর্শ

মালপত্র গুছাইয়া, বিছানা পাতিয়া দিতে দিতেই গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা দিল। চাকর রামশরণ এ গাড়ি হইতে নামিয়া যখন নিজের গাড়িতে গিয়া উঠিল, তখন ট্রেনখানা অল্প-অল্প চলিতে শুরু করিয়াছে।

প্রতিমা কহিল, হ্যাঁ গা, ও ঠিক গাড়িতে উঠ্‌তে পারল ত?

বিনয় খোলা দরজা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কহিল, হ্যাঁ, উঠেছে ঠিক!

তাহার পর দরজাটা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া প্রতিমার পাশে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, বিয়েটা আমাদের তা'হলে হ'ল শেষ পর্য্যন্ত! কি বলো?—

প্রতিমা লজ্জিত স্মিতমুখে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, কথা কহিতে পারিল না।

বাস্তবিক, ব্যাপারটা অনুভব করিতে কিছু সময় লাগারই কথা। যে বাধা এবং লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে তাহাদের, সমস্তগুলা লিপিবদ্ধ করিলে মহাভারতের মত একটা বিরাট পুঁথি হইয়া যায়। পর পর সব

ব্যাপারটা যেন বিদ্যুৎলেখার মত একবার প্রতিমার চোখের সামনে দিয়া চলিয়া গেল। সে শিহরিয়া উঠিয়া বিনয়ের গা ঘেঁসিয়া বসিল।

ব্যস্ত হইয়া বিনয় কহিল, কি হ'লো ?

প্রতিমা কহিল, কিছু না। বিয়ের কথাটাই ভাবছিলুম।

বিনয় কহিল, তা বটে।

তাহারও সব কথা মনে পড়িয়া গেল। রীতিমত উপন্যাস লেখা যায় তাহাদের বিবাহের ইতিহাসটা লইয়া। বিনয়ের বাবা ও প্রতিমার বাবা প্রতিবেশী হইলেও খুব বন্ধু কখনই ছিলেন না। মেয়েদের মধ্যে আসা-যাওয়া ছিল, সেটা তাঁহারা বন্ধ করিতে পারেন নাই—যদিচ সেখানেও একটা যে খুব প্রীতির সম্পর্ক ছিল তা নয়—কিন্তু পুরুষ দুটির মধ্যে সামান্য একটু দেঁতো হাসি ছাড়া কোন বাক্য বিনিময় হইত দৈবাৎ, হয়ত বৎসরে একদিন। প্রতিমার বাবা রমেশবাবু ছিলেন বিনয়ের বাবা সত্যবাবুর মতে—'হাড় কেপ্পন' এবং রমেশবাবু বলিতেন সত্য-বাবুকে 'চামার', 'দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না' ইত্যাদি—। সত্যবাবু বড় চাকরী করিতেন, সেই হেতু ভাল চাকরী যাহারা করে না, তাহাদের একটু কৃপার চোখেই দেখিতেন তিনি। আর রমেশবাবুর ছিল সামান্য আয়—বিরাট সংসার চালাইতে হইত তাঁহাকে অনেক হিসাব করিয়া, সুতরাং মিতব্যয়ী না হইয়া উপায় ছিল না।...উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ত' ছিলই না বরং সামাজিক ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ হইলে ঠোকাঠুকিও চলিত বেশ, যদিচ সবটাই হাসিমুখে।

এহেন সত্যবাবুর একমাত্র পুত্র বিনয় যখন এম-এস-সিতে প্রথম হইয়া নিজেই তদ্বির-তদারক করিয়া একটা মোটা সরকারী চাকরী বাগাইয়া

বসিল, তখন সত্যবাবুর গর্ব্ব ও আনন্দের অবধি রহিল না, তিনি মনে মনে জমিদারের কোন রূপসী কন্যার সহিত পঞ্চাশ হাজার টাকা যৌতুকের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু বিনয়ই দিল সব মাটি করিয়া—হঠাৎ সে বলিয়া বসিল যে, রমেশবাবুর কন্যা প্রতিমাকেই সে বিবাহ করিবে। আর ঠিক সেই সময়ে প্রতিমাও তাহার মাকে দিয়া রমেশবাবুকে জানাইল যে, সে সাবিত্রীর মত মনে মনে বিনয়কেই স্বামী ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। রমেশবাবুও বলিলেন 'না'—সত্যবাবুও তাই। ব্যাপারটা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত ঢাকুরিয়া লেকের ধারে হাস্যকর বিয়োগান্ত পরিণতিতেই পৌঁছিত, যদি না-দুটি বড় রকমের ভয় থাকিত। বিনয় তখনই পাঁচশত টাকা মাহিনা পাইতেছে—সে ভয় দেখাইল যে, সে পৃথক হইয়া স্বেচ্ছায় প্রতিমাকে বিবাহ করিবে এবং প্রতিমা ভয় দেখাইল, যে তাহার একুশ বৎসর বয়স হইয়াছে, সুতরাং বাবার বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিলে তাহার আটকায় না—সে কথা সে জানে এবং বাবা পুনর্বিবেচনা না করিলে তাহাই করিবে। সুতরাং অনেক বকাবকি, অনেক অপ্রীতিকর আলোচনা, পরস্পরের প্রতি প্রকাশ্যে ও পরোক্ষে বহু বাক্যবাণ বর্ষণের পর উভয় পক্ষই নরম হইলেন এবং বিবাহের কথাটা পাকাপাকিও হইয়া গেল।

তবু কি নির্ব্বিঘ্নে কাজটা চুকিয়াছে? শেষ মুহূর্ত্তেও সত্যবাবু গৃহিণীকে দিয়া বলাইলেন যে, এ-বিবাহ যদি হয় ত একদিন তাঁহাকে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিতে হইবে।

বিনয় সব কথা শুনিয়া বলিয়াছিল, তা, বেশ ত', উনি যদি আমার ইচ্ছায় বাধা না দেন ত' আমিও ওঁর ইচ্ছায় বাধা দেব না। মোদ্দা বিষয়-আশয় কোথায় কি করে রেখে গেলেন, ভাল করে লিখে রেখে যেতে বলো।

নবজীবনের প্রান্তে

মা কাত্যায়নী শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন, বলিস কীরে, মুখে উচ্চারণ করতে পারলি! ঐ রাক্ষুসী তোকে গুণ করেছে—নিশ্চয়ই। নইলে তুই ত, এমন ছিলি না!

বিনয় কহিয়াছিল, বাবাকে তোমার চেয়ে বেশি চিনি মা, তাই বলতে পারলুম।

সত্যই সে বেশী চিনিত। কথাটা গৃহিণীর মুখে শুনিয়া প্রথমটা সত্যবাবু জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন, হয়ত সুযোগসুবিধা থাকিলে, তখনই কি করিয়া বসিতেন বলা যায় না; কিন্তু পরে বিষয়-আশয়ের কথা যতই মনে হইতে লাগিল, বিশেষ করিয়া এখন তিনি মরিলে ঐ 'হাড় কেপ্পন' রমেশটার কত সুবিধা হইতে পারে এবং না মারিলে ছেলের আয় হইতে টাকা জমাইয়া আরও কত বিষয়-আশয় বাড়ানো যাইতে পারে —এই সব কথা যতই মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন, ততই মরিবার ইচ্ছা তাঁহার লোপ পাইতে লাগিল। ছেলের কথায় যে নিদারুণ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা আসিয়াছিল জীবন সম্বন্ধে, তাহাকে দমন করিয়া নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ করিতে বসিলেন।

কিন্তু তবু, কতটা যে তাঁহাকে সহ্য করিতে হইল, তাহাও বিনয়ের অবিদিত ছিল না। সে কথাগুলা ভাবিতে ভাবিতে এক সময়ে বলিয়া ফেলিল, সত্যি, মা-বাপের যা অভিশাপ কুড়োনো হ'ল—ফল কী হবে তাই ভাবছি!

কথাটা খুবই হাল্কা সুরে সে বলিল—পরিহাস বলিয়াও মনে করা চলিত। তবু কোথায় যেন প্রতিমার দিবাস্বপ্নে আঘাত লাগিল। সে একটু ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলিল, তোমার কি এখন অনুতাপ হচ্ছে?

না, ঠিক অনুতাপ নয়। তবে ভাবছি যে, এত কাণ্ডের কীইবা দরকার ছিল। এটা যেন জেদের মধ্যে পড়েই করা হ'ল না কি? সত্যই যদি তোমার অন্য জায়গায় বিয়ে হ'ত, তাহ'লে কি ভয়ঙ্কর কিছু করতে তুমি? দু-চারদিন মনে একটু কষ্ট হ'ত, তারপর আবার সব ভুলে মনের সুখে ঘরকন্না করতে—

বিনয় হাসিল।

প্রতিমাও হাসিবার চেষ্টা করিয়া প্রশ্ন করিল, আর তুমি? তুমিই কি আর ভয়ঙ্কর কিছু করতে?

তাচ্ছিল্যের সুরে বিনয় বলিল, কিছু না, কিছু না। জীবনে এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আছে নাকি? আমিও ঐ দুদিনেই ভুলতুম।

হঠাৎ প্রতিমার মুখের দিকে চোখ পড়িতে কণ্ঠে অস্বাভাবিক রকমের চাপল্য আনিয়া বিনয় কহিল, সে যাক্ গে, যখন অত কিছু হয়নি—তখন আর চিন্তা কি? যা হয়েছে—তা না হ'লে কি হ'ত, সে কথা এখন থাক্—।

বিনয় যত সহজে কথাটা উড়াইয়া দিল, প্রতিমা ততটা সহজে পারিল না। সে মনে মনে গভীর আঘাত পাইল। সে বাঙালীর ঘরের মেয়ে হইয়া বাপ-মায়ের সম্পূর্ণ অমতে, লোকলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া, সমাজের ভয় না করিয়া একান্তভাবে বিনয়কে পাইবার জন্য যে সাধনা করিয়াছে—এই কি তাহার পরিণাম। কী না করিয়াছে সে! কোন লাঞ্ছনা, কোন বাক্যবাণকে সে গ্রাহ্য করে নাই—ভবিষ্যতের কোন ভাবনা সে ভাবে নাই। সম্পূর্ণভাবে সেই দ্বাপরের গোপিনীদের মতই নিজেকে সে

সঁপিয়া দিয়াছে বিনয়ের পায়ে—সে কী এই জন্য? তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

অথচ বিনয়, যে বিনয়কে গত দুই বৎসর ধরিয়া অহর্নিশি স্বপ্ন দেখিয়াছে সে, সে ত' এমন ছিল না। প্রতিমার মনে পড়িল তাহার প্রথম কৈশোরের কথা। ঘরে পড়া হয়না বলিয়া ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার আগে বিনয় ঘোর শীতেও ভোরবেলা ছাদে পড়িতে উঠিত—বই হাতে করিয়া সে পায়চারী করিত আর অন্যমনস্কভাবে মুখস্থ করিতে করিতে চাহিয়া থাকিত পাশের বাড়ির দিকে—কখন প্রতিমা তাহাদের ছাদে উঠিবে বা ভিতরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইবে এই আশায়। শুধু এইটুকুর জন্যই সে সন্ধ্যার পর অন্ধকার হওয়া সত্ত্বেও ছাদ ছাড়িতে চাহিত না; ইহার জন্য মা কত অনুযোগ করিয়াছেন, হ্যাঁরে, এত রাত অবধি হিমে থাকিস কেন? অন্ধকারে কী লেখাপড়া হয়?...সে-সব কি শুধু স্বপ্ন? সব মিথ্যা!

কাজে-কর্ম্মে বা অন্য কোন প্রয়োজনে যখন দু'জনে দেখা হইত, প্রতিমার মনে পড়িল, বিনয় কোন কথা কহিতে পারিত না, শুধু নীরবে দাঁড়াইয়া ঘামিত। কথা কহিলেও গলা কাঁপিত তাহার। অথচ তখন প্রতিমা কতই ছোট, এসবের মর্ম্ম সে কিছুই বুঝিত না। শুধু বিনয়কে দেখিতে তাহার ভাল লাগিত, এইটুকু জানিত সে। প্রথম বিনয়ের কথা চিন্তা করিয়া বিনিদ্ররজনী যাপন করে যে দিনটিতে—সে দিনের কথা তাহার আজও মনে আছে। সেটা বি-এস-সি পরীক্ষার সময়, বোধ হয় কেমিস্ট্রী প্র্যাকটিক্যালের আগের দিন, বিনয়দের বাড়িতে সে আসিয়াছিল সিন্নি উপলক্ষে, প্রশ্ন

করিয়াছিল বিনয়কে, কেমন পরীক্ষা দিচ্ছ বিনুদা, ফার্স্ট হ'তে পারবে ত ?

বিনয় উত্তর দিয়াছিল, ফাঁড়া আছে কালকের দিনটায়, যদি নার্ভাস না হই, তা'হলে কোন ভয় নেই—

তারপর একটু থামিয়া গলা নামাইয়া বলিয়াছিল, না, ভালই দেব। নার্ভাস বোধ করলে একবার চোখ বুজে তোমাকে ভেবে নেব মনে মনে প্রতিমা, তা'হলেই মনে জোর পাব।

প্রতিমার কানের পাশ দুইটা সহসা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বেশী কথা কহিতে পারে নাই, শুধু বাড়ি আসিয়া সেদিন সে সারারাত জাগিয়াছিল, ঘুমাইতে পারে নাই। সেদিনই সে প্রথম অনুভব করে যে, বিনয়কে সে ভালবাসিয়াছে।......

তাহার পরের বৎসরই প্রতিমা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষার আগে সে বিনয়ের মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছিল এ-বাড়িতে। মাকে প্রণাম করিয়া সে বিনয়ের ঘরেও ঢুকিয়াছিল, প্রণাম করিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, কৈ আশীর্ব্বাদ করলে না, বিনুদা ?

বিনয় হাসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, কি আশীর্ব্বাদ করব ?

—এই আমি যেন ভাল করে পাশ করি।

—সে ত করবেই—আমার যোগ্য হতে হবে ত তোমাকে !

সামান্ত কয়েকটি কথা—হয়ত বা অর্থহীন, তবু যেন সেইদিনই প্রতিমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিল, সেই-দিনই যেন নিশ্চিতরূপে ঠিক হইয়া গিয়াছিল যে, প্রতিমার যত কিছু সাধনার একমাত্র লক্ষ্য বিনয়ই।...সেদিন পরীক্ষা দিতে বসিয়া বারবার প্রতিমা উন্মনা হইয়া

গিয়াছিল, প্রশ্নপত্রের মধ্যে যেন ছাপার হরপে কথা কয়টা ফুটিয়া উঠিতেছিল বারবার—এবং হয়ত সেইজন্যই, প্রতিমার ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করা হয় নাই …

কথাগুলি আদ্যোপান্ত ভাবিতে ভাবিতে প্রতিমা যেন মনে জোর পাইল। এমনি করিয়া তিলে তিলে যে প্রেম তাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কি একেবারে অর্থহীন হইতে পারে? না, না, কখনই না।

সে যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল বিনয়ের দিকে। সবল, বলিষ্ঠ, সুন্দর স্বামী তাহার, আনন্দময় ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে—এসব কি ছাইভস্ম ভাবিতেছে সে?…বিনয়ও যদি তাহার কথা অহর্নিশি না ভাবিত, যদি তাহাকে পাইবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত না হইত, তাহা হইলে কি শুধু প্রতিমার ইচ্ছায় এ বিবাহ সম্ভব হইত। বিনয়ও ত কম লাঞ্ছনা সহ্য করে নাই।…তা'ছাড়া এই যে ফুলশয্যার পরের দিনই এই যাত্রার ব্যবস্থা—এ সবই ত সে করিয়াছে। এখানে বধূকে ফেলিয়া রাখিয়া গেলে যে তাহার বাপ-মায়ের কাছে বহু গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে প্রতিমাকে, তাহা বিনয় জানিত। তাই সে জোর করিয়া এই ব্যবস্থা করিয়াছে। অফিসের ছুটি এখনও আছে, কিন্তু বিনয় মিথ্যাকথা বলিয়া ঠিক বৌ-ভাতের পরের দিনটিতেই যাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিল। বহু অর্থব্যয় করিয়া ফার্স্ট ক্লাশ 'কূপে' রিজার্ভ করা এবং দ্রুতগামী মেল ট্রেনের পরিবর্ত্তে এক্সপ্রেস ট্রেনে যাওয়ার ব্যবস্থা করা, যাহাতে তাহার মধুচন্দ্রমা ক্ষুদ্র কামরার মধ্যে নিবিড়ভাবে জমে—এ সবই যে বিনয় করিয়াছে, তাহাতে ত সন্দেহ

নাই। তাহার এত সাধনা, এত তপস্যার ফলকে বিনয় একান্ত করিয়া, সুন্দর করিয়া নিভৃতে অনুভব করিতে চায়!

অকস্মাৎ সশব্দ একটা উদ্‌গার তুলিয়া বিনয় নড়িয়া চড়িয়া ভাল করিয়া বসিল। সেও এতক্ষণ কী ভাবিতেছিল, বোধ হয় বাবার কথাই। সহসা এখন চমক ভাঙ্গিয়া প্রতিমাকে বলিল, তাড়াতাড়িতে, উদ্বেগে খাওয়া কিছুই হয়নি। তোমারও বোধ হয় তাই, না।

প্রতিমা লজ্জিত নতমুখে ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, খাওয়ার ইচ্ছাই কি আছে এখন? ও-সব কথা এ ক'দিন মনেও ছিল না—

তা বটে। মোদ্দা ছুটোছুটি করে তেষ্টাও পেয়েছে খুব। ফ্লাস্ক থেকে একটু চা ঢালো দেখি।

প্রতিমার মুখ শুকাইয়া উঠিল। ভয়ে ভয়ে কহিল, চা ত নেই ওতে—

নেই? সেকি! বিনয়ের কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল।

প্রতিমা অপ্রতিভ হইয়া কহিল, মাকে দু-তিনবার বলেছিলুম; কিন্তু তিনি অত গ্রাহ্য করেননি। একেবারে বেরোবার সময় দেখলুম, তৈরী হয়নি তখনও—।

বেশ! অত্যন্ত বিরক্তকণ্ঠে বিনয় কহিল, বেশ হয়েছে। অত ক'রে যেটা বলে দিলুম, সেইটাই হ'ল না। ট্রেনে উঠলে আমার মুহুর্মুহু তেষ্টা পায়, তা ত জানো।……তুমি ত আর এ বাড়িতে একেবারে নতুন নও, মাকে না বলে নিজেও ত করে নিলে পারতে? তুমি যা আমার সংসার চালাবে, তা এই নমুনাতেই বুঝেছি!

নবজীবনের প্রান্তে

প্রতিমা নতমুখে বসিয়া রহিল, জবাব দিল না। এ তিরস্কার তাহার প্রাপ্য নয়, সে এ বাড়ির পরিচিতা মেয়ে হইলেও আজ সে নববধূ, আজই যদি গৃহিণীকে ডিঙাইয়া গৃহিণীপনা করিতে যায়, তাহা হইলে চারিদিকে তাহার যে দুর্ণাম রটিবে, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই; এ সব কথাই সে বিনয়কে বলিতে পারিত, কিন্তু তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সামান্য ত্রুটিতে যে এমন মর্ম্মান্তিক তিরস্কার করিতে পারে, তাহাকে কী-ই বা বলিবে সে?

বিনয় তখনও আপন মনেই বকিয়া চলিয়াছে, সেই ব্যাণ্ডেলের আগে এ গাড়ি থামবে না, সেখানেও চা পাবো কি না, তার ঠিক কি? কেল্‌নারের লোক কি আর এই ঠিক-দুপুরে গাড়ির ধারে আসবে খোঁজ করতে?

প্রতিমা একটু পরে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক করিয়া প্রশ্ন করিল, স্পিরিটল্যাম্প ত সঙ্গেই রয়েছে, জ্বেলে চা করে দেবো?

পারো ত দাও না, শুনছই ত যে আমার বিষম তেষ্টা পেয়েছে—

টিফিনের ঝুড়িতে সে স্পিরিটল্যাম্প, শিশিতে স্পিরিট, টিনের দুধ, চা-চিনি সবই গুছাইয়া লইয়াছিল। অবশ্য এ নির্দ্দেশও বিনয়ের —ফুলশয্যার রাত্রে সে এই সব নির্দ্দেশই দিয়াছে বেশি—অন্য কথা খুবই কম হইয়াছে তাহাদের।

প্রতিমা ছোট প্যানটা করিয়া কুঁজা হইতে জল লইয়া চাপাইয়া দিল। বিনয় তখন টাইম-টেব্‌ল্ দেখিতে ব্যস্ত ছিল, সহসা মুখ তুলিয়া কহিল, বলি ও কি হচ্ছে? জানলাগুলো বন্ধ করো নি, এই বাতাসে কতক্ষণে জল গরম করবে?......আঁচ ত সব বাইরেই যাচ্ছে, প্যানের গায়ে লাগছে কৈ?

নবজীবনের প্রান্তে

প্রতিমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া সার্সিগুলো বন্ধ করিয়া দিল। দোষ তাহারই, বাস্তবিক এ কথাটা তাহারই ভাবা উচিত ছিল আগে, তবু বিনয়ের তিরস্কারের ভঙ্গিতে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে বিনয়ের দিকে পিছন ফিরিয়া জল দেখিবার ছুতা করিয়া গোপনে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

চা প্রস্তুত হইল। পেয়ালাটা প্রতিমার হাত হইতে লইয়া একটা চুমুক দিয়া বিনয় আরামসূচক একটা ধ্বনি করিয়া কহিল, তোমার কৈ ?

প্রতিমা মৃদুস্বরে কহিল, আমি এখন খাবো না। এমন সময়ে চা আমার ভাল লাগে না।

বিনয়ের ততক্ষণ আরও দু-এক চুমুক পেটে পড়িয়াছে। সে অপেকাকৃত স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, তবু একটু খেলে পারতে—কদিন যা স্ট্রেন্ যাচ্ছে, তার ওপর আজ সকাল থেকে হুড়োহুড়ির ত শেষ নেই। তোমার মুখটা বড্ডই শুক্‌নো দেখাচ্ছে, শোও না একটু !

প্রতিমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। এত কাণ্ডের পর, জীবনে এই প্রথম তাহারা নিভৃতে নিশ্চিন্তভাবে মিলিত হইয়াছে—সে কি ঘুমাইবার জন্য ?

চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া বিনয় কহিল, তাহ'লে আমি একটু গড়িয়ে নিই, কি বলো ?

শোও না—বলিয়া প্রতিমা আর একটু ধারে সরিয়া বসিল। সে ভাবিয়াছিল বিনয় বোধ হয় তাহার কোলেই মাথা দিয়া শুইবে, কিন্তু বিনয় সে ধার দিয়াও গেল না, বালিশ দু'টা ঠিক করিয়া সাজাইয়া সে বেশ ভাল করিয়াই গুছাইয়া শুইল।

নবজীবনের প্রান্তে

এ-ও প্রতিমার একটা স্বপ্ন ছিল বৈ কি। কাঁথার মত ঘন কালো চুল বিনয়ের, কতবার প্রতিমার লোভ হইয়াছে ঐ চুলের মধ্যে আঙুল চালাইয়া বিনয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়, কিন্তু এতদিন সুযোগ পায় নাই। এখন বিনয় তাহার কোলে মাথা দিলে সে নিশ্চয়ই তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিত, কিন্তু সামান্য বালিশের ব্যবধানে এমন একটা দূরত্ব রচিত হইল যে তাহার ঠিক সাহসে কুলাইল না—মনে হইল কি জানি, যদি কিছু মনে করে বিনয়!

এই কথাটাই ভাবিতেছে সে, সহসা বিনয়ের নাক ডাকার শব্দে প্রতিমার চমক ভাঙিল। বিনয়ের যে নাক ডাকে—এটা প্রতিমা জানিত না। সে একটু বিস্মিত হইয়াই চাহিল বিনয়ের দিকে। বিনয় অঘোরে ঘুমাইতেছে, ক'দিনের অত্যাচার আর রাত্রি-জাগরণে চোখটা তাহার অনেকখানিই বসিয়া গিয়াছে, ফলে গালের উপরের হাড় দুইটা দেখাইতেছে বেশী রকমের উঁচু, আর নাকটাও যেন তাহার অস্বাভাবিক মোটা।

ঘুমন্ত বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ প্রতিমার মনে হইল—এ যেন সে সুন্দর বিনয় নয়—এ যেন আর কেহ।

ছি, ছি—এ কী ভাবিতেছে সে! প্রতিমা যেন নিজের উপরেই বিরক্ত এবং লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার কি হইয়াছে, এ সব কি ছাই-ভস্ম তাহার মনে হইতেছে? সে বাথরুমে গিয়া মুখে চোখে জল দিয়া আসিয়া বসিল। এবারে জোর করিয়া সে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিবে, অন্য কথা ভাবিবে।

নবজীবনের প্রান্তে

ব্যাণ্ডেল স্টেশনে গাড়ি থামিতেই বিনয়ের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া দেখিল প্রতিমা তাহার শিয়রে বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একবার ভাবিল সে তাহাকে ডাকিয়া ভাল করিয়া শোয়াইয়া দেয়, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল তাহাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনাই বেশী এবং একবার ঘুম ভাঙ্গিলে লজ্জায় সে আর হয়ত ঘুমাইতে চাহিবে না। উপরি-উপরি তিন-চার রাত্রিই ত বলিতে গেলে জাগিয়া আছে বেচারী, ঘুমাইতে পারে ত ঘুমাক।

রিফ্রেশমেণ্টের চাপরাশী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে চা আনিতে ফরমাস করিয়া বিনয় একটা সিগারেট ধরাইল। ট্রেনে উঠিলেই তাহার মুহুর্মুহু চা লাগে। এমনিই সে চা যে একটু বেশী খায় তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই বদভ্যাসের জন্য আগে বাবা কত তিরস্কার করিয়াছেন, তবু সে অভ্যাসটা ছাড়িতে পারে নাই।

চা খাইতে খাইতে বাবার কথাই মনে পড়িল। এ কয়দিন তিনি তাহার সহিত ভাল করিয়া কথাই বলেন নাই। আজও যাত্রার সময় সে যখন প্রণাম করিতে গেল তিনি তখন গম্ভীর হইয়াই রহিলেন, শুধু 'গিয়ে চিঠি দিও' এই তিনটি শব্দ ছাড়া একটি কথাও কহিলেন না। অথচ, বিনয়ের মনে পড়িল, বাবা বরাবরই তাহার সহিত গল্প করিতে ভালবাসেন। যখন সে নিতান্ত ছোট, তেজারতির অ-আ-ক-খও জানিত না, তখনই আহারে বসিয়া বাবা প্রত্যহ তাহার সহিত বৈষয়িক কথা আলোচনা করিতেন। একমাত্র ছেলে বলিয়া নয় শুধু, ছেলেটি তাঁহার বন্ধুর মতই আত্মার সহিত জড়াইয়া থাকিত বলিয়া—তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার কত গর্ব্ব, কত আনন্দ!

নবজীবনের প্রান্তে

নাঃ, বাবাকে বড্ডই আঘাত করা হইয়াছে। কোথাকার জমিদারের এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা দেখিয়া তিনি পছন্দ করিয়া আসিয়াছিলেন, সেখানে কথাও একরকম দেওয়া হইয়াছিল। কারণ তিনি জানিতেন, বিনয় কখনও তাঁহার ব্যবস্থার উপর কথা কহিবে না। অথচ—সে গর্ব্ব তাঁহার ধূলিসাৎ হইল, মাথা হেঁট করিয়া তাঁহাকে জানাইতে হইল যে, এভাবে কথা দেওয়ার কোন অধিকারই তাঁহার ছিল না।…সে মেয়ের ফোটোও বিনয় দেখেছে। সত্যই সে রূপসী, আর নাকি অসম্ভব ঠাণ্ডা —অন্তত মা তাই বলেন। তাহার কাছে, বিনয় ঘুমন্ত প্রতিমার দিকে চাহিয়া দেখিল, প্রতিমা কিছুই নয়। প্রতিমার রূপ-গৌরব কোন-দিনই ছিল না। রং বিনয়ের চেয়ে দুই-তিন পোঁচ কালো, মুখেরও কোথাও কোন সৌষ্ঠব নাই। চোখ ছোট, থুৎনির কাছটা একটু বেশী সরু, চোখের কোলে অস্বাভাবিক কালী। না, রূপ দেখিয়া পছন্দ করার মত কিছু নাই। কীই বা আছে, গুণ? তাও ত এই নমুনা। যে বিনয় তাহার জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া, এত কাণ্ড করিয়া, বলিতে গেলে সমস্ত সংসারের সহিত বিবাদ বাধাইল—তাহার সামান্যতম ইচ্ছাটারও মর্য্যদা রাখিতে পারিল না প্রতিমা, সেখানেও এত ভুল! বাপ মায়ের অভিশাপ কুড়াইয়া, সকলকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাহাকে বাছিয়া লইবার কী মূল্য দিল প্রতিমা? ছি!…

বিনয় আর একটা সিগারেট ধরাইয়া কাগজখানা টানিয়া লইল। প্রতিমা অঘোরে ঘুমাইতেছে, মুখটা ফাঁক হইয়া গিয়াছে, চোখের পল্লব অর্দ্ধনিমীলিত, যেন মড়ার মত ঘুম। আশ্চর্য্য, ইহারই জন্য কি সে পাঞ্জাব মেলে না গিয়া পাঞ্জাব এক্সপ্রেস বাছিয়া লইল, যাহাতে দীর্ঘ দুটি

রাত্রি-দিন তাহারা নিবিড় আনন্দে, অভিনব পরিবেশের মধ্যে কাটাইতে পারে—সুদীর্ঘ স্বপ্নের মত দুটি রাত্রি দিন ?···প্রতিমা ত ঘুমেই অচেতন। এত ঘুম !···এই অলজ্ঘ্য বাধা-বিপত্তির পরে প্রথম মিলনের ক্ষণটিতে ঘুমাইতে পারিল সে ?···অবশ্য বিনয়ও চোখ বুজিয়াছিল সত্য কথা, অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও রাত্রি জাগরণে চোখটা না বুজিয়া পারে নাই, কিন্তু সে কতক্ষণই-বা, কয়েক মিনিট পরেই ত সে উঠিয়া বসিল। অথচ প্রতিমা—

আচ্ছা, কী দেখিয়া প্রতিমাকে এত ভালবাসিয়াছিল সে ? ছেলে-মানুষী ত কম করে নাই প্রতিমাকে কেন্দ্র করিয়া !—কেন ? প্রতিমার কণ্ঠস্বরের আভাসে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছে গত চার বৎসরের প্রতিটি দিন-রাত্রি। এমন কী মূল্য আছে তাহার ?...বিনয় অনেক ভাবিয়া দেখিল, না, কোন মূল্যই নাই। এ তাহার নিজেরই প্রথম যৌবনের অপরিসীম তৃষ্ণা, হাতের কাছে আর কোন মেয়ে ছিল না বলিয়াই একমাত্র যে কিশোরী চোখের সামনে দেখা দিয়াছে, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া সে দিনের পর দিন মিথ্যা স্বপ্ন রচিয়াছে !...

কোন্ একটা স্টেশনের বাহিরে সিগ্‌নাল না পাইয়া গাড়ীখানা হঠাৎ থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিনয়েরও যেন চমক ভাঙিল। ছি ছি, এ সব চিন্তা কি তাহার।...এমন কথা তাহার মাথায় গেল কি করিয়া। প্রতিমার সম্বন্ধে এমন সব নিষ্ঠুর চিন্তা তাহার মাথায় আসে ! আছে বৈকি প্রতিমার মূল্য।···প্রতিমাও ত কম করে নাই তাহার জন্য। সে পুরুষ, মোটা টাকা মাহিনা পায়, বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান, তাহার পক্ষে বাপ-মায়ের সহিত ঝগড়া করা সোজা ; কিন্তু প্রতিমার ত এ সব

কোন সুবিধাই ছিল না। তবু সে করিয়াছে, সে কী একেবারেই নিরর্থক।

শুধু কি তাই। মনে আছে একবার তাহার মায়ের-অনুগ্রহ হইয়াছিল। খুব বেশী রকমের নয়, তবু প্রতিমার সে কী কান্না, আর কাছে থাকিবার জন্য সে কি আকুলতা! যে রোগে সবাই ভয় পায়, সে রোগের সেবা করিতে পারিল না বলিয়া প্রতিমার সেদিনের সে কান্না কি ভুলিবার? প্রতিমা তাহাকে খুবই ভাল বাসে, হয়ত সর্ব্বস্ব দিয়াই ভালবাসে, সামান্য ত্রুটি ধরিয়া সে প্রেমের অমর্য্যাদা করা অমানুষের কাজ!

বিনয় চঞ্চল হইয়া নড়িয়া বসিল, অকস্মাৎ যেন তাহার সেই প্রথম যৌবনের আবেগের সঞ্চার হইয়াছে তাহার মনে—এতদিন পরে। প্রতিমার একান্ত প্রেমের সমস্ত নিদর্শনগুলি ভীড় করিয়া মনে আসিতেছিল। সে বোধ হয় গত বছরের কথা, কী একটা উপলক্ষ্যে দুটি পিতার মধ্যে বিবাদটা কিছুদিনের জন্য বেশী রকম পাকিয়া উঠিয়াছিল, দুইজনে বহুদূর হইতে ছাড়া দেখা-সাক্ষাৎ হইত না—সেই সময়েই একদিন হঠাৎ একটা নির্জ্জন অবসরে দুটি বারান্দায় দাঁড়াইয়া দুইজনে মিনিট খানেকের জন্য কথা কহিবার অবসর পাইয়াছিল। প্রতিমা বলিয়াছিল বিনয়কে, আমি আমাদের গলির ঐ পাথরগুলোকেও আজকাল হিংসে করতে শুরু করেছি।

বিস্মিত হইয়া বিনয় প্রশ্ন করিয়াছিল, কেন?

—তবুত তুমি রোজ ঐ পাথরগুলো মাড়িয়ে যাও, ওরা ত তোমাকে ছুঁতে পায়!

নবজীবনের প্রান্তে

সেদিনের কণ্ঠস্বর আজও মনে পড়িয়া বিনয়ের সারা দেহ রোমাঞ্চ হইল।···না, সে প্রতিমাকে বিবাহ করিয়া একটুও ভুল করে নাই।

.

সে কাগজটা ফেলিয়া দিয়া ঝোঁকের মাথায় একেবারে ঘুমন্ত প্রতিমাকেই জড়াইয়া ধরিল।

ওগো শুন্‌ছ! ওঠো না, কত ঘুমোবে?

প্রতিমা গাঢ় ঘুম হইতে আচম্বিতে জাগিয়া প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারিল না। রক্তাভ বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া আচ্ছন্ন ভাবে চাহিয়া রহিল বিনয়ের মুখের দিকে। বিনয়ের অসহিষ্ণু আবেগ এই মূঢ় বিহ্বলতাতে ঠেকিয়া যেন একটা ধাক্কা খাইল। সে অপ্রসন্ন মুখে প্রতিমাকে ছাড়িয়া দিয়া আবার নিজের কাগজটা তুলিয়া লইল।

কিন্তু প্রতিমার সে আচ্ছন্নভাব মুহূর্ত্ত কয়েক পরেই কাটিয়া গেল। সে সবেগে চোখ দুইটি রগড়াইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; তারপর লজ্জিতভাবে কহিল, বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, না?

বিরক্তি বিনয়ের কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছিল, অতিকষ্টে চিত্ত দমন করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, জবাব দিল না। প্রতিমাও তাহার অন্ধকার মুখের দিকে চাহিয়া আর কথা কহিতে সাহস করিল না। অপরাধটা সহসা এক মিনিটের মধ্যে কি করিয়া এবং কোথায় ঘটিয়া গেল বুঝিতে না পারিরা মুখে চোখে জল দিবার জন্য বাথরুমে চলিয়া গেল।

একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া কতকটা ভয়ে ভয়েই কহিল, চা একটু তৈরি করব, খাবে?

কাগজটা হইতে মুখ না তুলিয়াই বিনয় জবাব দিল, তুমি খাওত করো, আমার দরকার নেই!

আবার চুপচাপ। পাশাপাশি বসিয়া দুজনে দু'দিকে চাহিয়া রহিল। ট্রেন চলিতেছে হু-হু করিয়া, কোন্ স্টেশন পার হইয়া গেল প্রতিমার তাহা জানা নাই—এমনভাবে আরও দুইটা দিন কেমন করিয়া কাটিবে তাহা সে ভাবিয়া পায় না। ইহার চেয়ে বাড়িতে থাকিলে ঢের ভাল হইত, তবু হাতে কাজ থাকিত, এত কাছাকাছি, অথচ এত দূরে ভাল লাগে না।

···একটু পরেই ট্রেনের গতি কমিয়া বর্দ্ধমান স্টেশনে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। হৈ-চৈ, লোকজন, প্রতিমা তবু একটু যেন প্রাণ পাইল। রামশরণ আসিল খোঁজ করিতে, কিছু চাই কি না। বিনয় তাহাকে টাকা দিয়া বলিল, যা ঐ স্টল থেকে ভাল মিহিদানা কিনে নিয়ে আয়, আর চা দিতে বল কেল্‌নারের লোককে—

রামশরণ চলিয়া গেল। দুইজনেই প্লাটফর্ম্মের দিকে চাহিয়া বসিয়া—বিষম ভীড়, পেষাপিষি চলিতেছে সামান্য মাত্র স্থানের জন্য। একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাহারই মধ্যে যেন দিশেহারা হইয়া আসিয়া তাহাদের গাড়ির হাতলে হাত দিলেন।

বিনয়ের সমস্ত বিরক্তিটা তাঁহার উপর গিয়া পড়িল, ওকি মশাই দেখতে পাচ্ছেন না এটা ফাস্ট´ ক্লাস, কানা নাকি?

কণ্ঠস্বর যেমন রুক্ষ, তেমনি অপমানকর। বৃদ্ধটি একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, দেখেছি, আমার অবিশ্যি সেকেণ্ড ক্লাশ টিকিট, কিন্তু কি করব জায়গা পেলুম না কোথাও। এখানেই উঠি, না হয় ফাস্ট´ ক্লাসের ভাড়াই দেব। যাবো সামান্য পথই, রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত।

তিনি হাতল ঘুরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। বিনয় উঠিয়া গিয়া রূঢ়ভাবে তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া কহিল, দেখেছেন ত, আর একটু দেখলে হ'ত! এটা রিজার্ভড্ গাড়ি!

ভদ্রলোক অপ্রস্তুতভাবে 'কিছু মনে করবেন না' বলিয়া আবার ভিড়ের মধ্যে ছুটাছুটি শুরু করিলেন। বিনয়ের অকারণ রূঢ়তায় প্রতিমার সমস্ত মনটা বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে আর থাকিতে না পারিয়া কহিল, ভদ্রলোক সামান্য পথ ত যেতেন, একটু উঠতে দিলেই হ'ত। বুড়োমানুষ হয়ত উঠতেই পারবেন না—

তেমনি তিক্ততার সহিতই বিনয় জবাব দিল, অত দয়াদাক্ষিণ্য করবার জন্যে এক গাদা টাকা দিয়ে গাড়ি রিজার্ভ করি নি। যত সব নন্‌সেন্স!

প্রতিমা চুপ করিয়া গেল। ইহার সহিত তর্ক করিয়া লাভ নাই! শোভনতাবোধ যুক্তি দিয়া মাথায় ঢোকানো যায় না। এই লোকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা পাশ করিয়াছে—বিশ্বাস করিতেও যেন প্রবৃত্তি হয় না।···অথচ, উচ্চশিক্ষিত স্বামীই তাহার আবাল্য কাম্য ছিল। সে যখন নিজে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছে সেই সময়ে বাবা একটি সম্বন্ধ আনিয়াছিলেন। পাত্রটি আই-এ ফেল, সরকারী চাকরী করে। মাঝারি গৃহস্থ—নিতান্তই সাধারণ পাত্র। সমস্ত শুনিয়া প্রতিমা নাক তুলিয়া বলিয়াছিল, কলিকাতা ইউনিভার্সিটির আই-এ যে পাশ করতে পারেনি তাকে বিয়ে করবার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভাল বাবা!

রমেশবাবু ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলিয়াছিলেন, লেখাপড়া শেখেনি বটে কিন্তু ছেলেটি বড় ভদ্র রে!

হ্যাঁ ভারি ভদ্র, লেখাপড়া শেখেনি সে আবার ভদ্র!

রমেশবাবু খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিলেন, আমিও ত বেশী লেখাপড়া শিখিনি মা, তাহ'লে আমিও অভদ্র বল! আমার মত বয়স যখন হবে তখন বুঝবি যে, অন্তত আমাদের দেশে শিক্ষা ও ভদ্রতা এক নয়—

প্রতিমা অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল, জবাব দিতে পারে নাই। সে বিবাহ অবশ্য হয় নাই, কিন্তু আজ এতদিন পরে সেই কথাগুলিই মনে পড়িয়া তাহার চোখে জল আসিয়া গেল।

রামশরণ ইতিমধ্যে মিহিদানা লইয়া আসিল। প্রতিমা তাহার হাত হইতে চ্যাঙারীটা লইয়া প্লেটে করিয়া অর্দ্ধেকেরও বেশী সাজাইয়া বিনয়ের সামনে দিল। রামশরণকেও একটা পাতায় করিয়া কিছু দিয়া বাকীটা সরাইয়া রাখিতেছে দেখিয়া বিনয় প্রশ্ন করিল, তুমি নিলে না?

প্রতিমা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমায় এখন খেতে ইচ্ছে নেই।

বিনয় বিদ্রূপের স্বরে কহিল, তা বটে। তোমাদের আবার খাবার ইচ্ছে না থাকাটাই চাল।···আমি বাপু কিন্তু তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব না। ট্রেনে উঠলেই আমার ক্ষিদে পায়—

প্রতিমা শান্তকণ্ঠেই জবাব দিল, তুমি খাও না, সত্যিই আমার ক্ষিদে নেই—

বিনয় তখন মুঠা মুঠা মিহিদানা মুখে পুরিতেছে। সেই অবস্থাতেই, প্রায় বদ্ধস্বরে বলিল, না খাও ত আমাকে আর দুটি দিতে পারো—

—নাও না! বলিয়া প্রতিমা তাহার প্লেট পুনরায় ভরিয়া দিল। তাহার পর মৃদুকণ্ঠে কহিল, খাবারও ত ঢের রয়েছে সঙ্গে, খাবে কিছু? বার করে দেব?

না-না, বিনয় প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িল, ওসব খাওয়ার সময় ঢের পড়ে রয়েছে, এটা মিহিদানা খাবার ক্ষিদে, বুঝলে না—

প্রতিমা আর কথা না কহিয়া এক গ্লাস জল গড়াইয়া দিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল। বিনয়ের সমস্ত মুখ-ভাবে যে একাগ্র লোলুপতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা দেখা অন্তত প্রতিমার পক্ষে কঠিন।

একটু পরেই জলের গ্লাসটা এক নিশ্বাসে শেষ করিয়া বিনয় কহিল, দাও, আর একটু জল দাও—

কুঁজা ছোট, জলও বোধহয় পুরা ছিল না, তাহার উপর চা-পর্ব্বে অনেকটা জল বাজে খরচ হইয়া গিয়াছে। এখন গড়াইতে গিয়া আধ গ্লাসের বেশী হইল না।

বিনয়ের কণ্ঠস্বর আবার তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, ওকি জল আর নেই?

প্রতিমা অপরাধীর মত নতমুখে জবাব দিল, না।

আর এক পর্দ্দা গলা চড়াইয়া বিনয় কহিল, তা সেটা বুঝি আর একটু আগে বলতে পারলে না। রামশরণকে দিয়ে আনিয়ে নেওয়া উচিত ছিল না তোমার?...মানুষের খাবার জল চাই, সেটাও হুঁস থাকে না?...সেই অণ্ডালে গিয়ে গাড়ি আবার থামবে—ততক্ষণ খাই কি?...তুমি মানুষ না জন্তু?

সে রাগ করিয়া মিহিদানার প্লেটটা সুদ্ধ জানালা গলাইয়া ছুঁড়িয়া

ফেলিয়া দিল। তাহার পর গ্লাসের জলটুকুতে হাত ধুইয়া চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইল।

প্রতিমা আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল—তাহার চোখের জলও এই তিরস্কারের কাঠিন্যে এবং আকস্মিকতায় যেন শুকাইয়া গিয়াছিল।

গাড়ি হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে গড়াইয়া পড়িল, অপরাহ্ন হইতে সন্ধ্যা। নির্জ্জন গাড়ির মধ্যে দুইটি সদ্য বিবাহিত নর-নারী তেমনি আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া। অথচ এই যাত্রার কী স্বপ্নই না দেখিয়াছে ইহারা এই কয়দিন ধরিয়া। কেন এমন হইল, কাহার দোষে —তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। শুধু যে নির্জ্জনতা আজ সকাল পর্য্যন্ত দুজনের একান্ত কাম্য ছিল, এখন তাহাই যেন অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইল।

কে জানে, হয়ত তাহাদের বাসা বাঁধিবার কল্পনা, ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্নও এমনি ভাবেই খান খান হইয়া ভাঙিয়া যাইবে।

উপহার

ক্যাস বাক্সের খোপে, আলমারীর আনাচে কানাচে, বিছানার তলায়, হাত বুলিয়ে জ্যোস্না খুঁজতে লাগলো। সময় অসময়ে এইস্থানগুলো বড় উপকারে আসে—সেবার স্বামীর অসুখের সময় সে এমনি করে চার দিন সংসার চালিয়েছিল। কিন্তু আজ ঝেড়েমুছে যা বেরুল তাতে তার মুখ শুকিয়ে গেল—দুবার তিনবার করে গুণেও চোদ্দ আনা তিন পয়সার বেশী কিছুতেই হলো না। কাল ইলেকট্রিকের বিল দেবার শেষ তারিখ, অথচ মাসকাবারের এখনো তিনদিন বাকী, তাকে সংসার চালাতে হবে। অবশ্য তার কাছে মাসকাবারি খরচের যা অবশিষ্ট ছিল তার সঙ্গে এই ক'আনা যোগ করলে হয়ত আলোর বিল শোধ হয়েও কোন রকমে এ মাসটা কেটে যায়। কিন্তু জ্যোৎস্নার ভাবনার আসল কারণ তা নয়, তার চেয়েও বুঝি বড়—

আজ তাদের বিবাহের তারিখ। প্রতি বছর এইদিনে তারা কিছু উৎসবের আয়োজন করে। ফুল দিয়ে ঘর সাজায়, বন্ধু-বান্ধব দু' চার জনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায় তারপর, সব শেষে অশোক জ্যোৎস্নাকে একটা কিছু উপহার দেয়, আর জ্যোৎস্না অশোককে কিছু দেয়। এমনি করে বিবাহের দিনটার স্মৃতি তারা প্রতি বছর একবার করে উজ্জ্বল করে নেয় নব নব উপহারের ভিতর দিয়ে।

নবজীবনের প্রান্তে

খরচ যা লাগে তা অশোকই দেয়, তবে আয়োজনটা সব করতে হয় জ্যোৎস্নাকে। তাই আজ যখন অশোক খেয়ে দেয়ে আফিসে বেরিয়ে গেল এবং আজকের এই বিশেষ দিনটির নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করলে না তার কাছে তখন জ্যোৎস্না রীতিমত বিপদে পড়ল। সে একবার ভেবেছিল মুখ ফুটে স্বামীকে সে-কথা জিগ্যেস করবে কিন্তু লজ্জায় পারে নি। স্বামীর বর্ত্তমান দারিদ্র্যের কথা সে ভালো করেই জানতো তাই বোধহয় বলতে গিয়েও মুখে আটকে গিয়েছিল।

দুপুর বেলা একা ঘরে শুয়ে শুয়ে জ্যোৎস্না ভাবতে লাগলো কি করবে! এই দিনটির আনন্দ কি তবে আজ থেকে শেষ হয়ে গেল? উপায় কি, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে কত লোকের কত বাসনাই ত এমনি করে অপূর্ণ থেকে যায়। সে মনকে এই ভাবে বারবার বোঝাতে লাগলো। স্বামীর জন্যে জ্যোৎস্নার দুঃখ হয়। বাস্তবিক তার কি দোষ। কোন রকম উপায় থাকলে সে কি চুপ করে থাকতো আজ? এই গেল, বছরেও সে তার আংটিটা বিক্রি করে উৎসবের আয়োজন করেছিল। জ্যোৎস্না বরং তাকে নিষেধ করেছিল কিন্তু অশোক শোনে নি কিছুতেই, বলে ছিল পয়সাটা হাতের ময়লা, আজ আছে কাল নেই— কিন্তু এই দিনটি গেলে জীবনে আর কখনো ফিরে আসবে না। প্রথম বছরের কথা জ্যোৎস্নার মনে পড়লো, একটি হীরের 'নেকলেস' অশোক তাকে উপহার দিয়েছিল। তারপরের বছর একজোড়া হীরের দুল— আর সে মনে করতে পারলে না, মাথার মধ্যে কেমন যেন করতে লাগল। সে-সব গেছে, এখন আর কিছুই নাই! এমন কি গেল-বছরের আগের বছরও এই দিনে যে টেবিল হারমোনিয়মটা অশোক তাকে দিয়েছিল

সেটাও বিক্রী করতে হয়েছে টাকার অভাবে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জ্যোৎস্না একবার ঘরের চারিদিকে চাইলে। বিক্রী করবার মত আজ আর তাদের কোন জিনিষ অবশিষ্ট নেই। ঘরের টেবিল চেয়ার থেকে খাট আলমারী ইলেক্‌ট্রিক পাখাটি পর্য্যন্ত ভাড়া করা। সাহেব পাড়ার ফ্ল্যাটের এই নিয়ম। তাদের এই সুসজ্জিত ঘরের জন্যে মাসে মাসে ভাড়া দিতে হয় বাড়ীওয়ালাকে। এর জন্যেও জ্যোৎস্না অশোককে বলেছিল, কি দরকার এত বাড়ীভাড়া গুণে, তার চেয়ে চলো ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে বাঙ্গালী পাড়ায় একটা দুটো ঘর ভাড়া করি গে। কিন্তু অশোক রাজী হয় নি। সে বলেছিল "ভেক না হলে ভিক মেলে না'। যুদ্ধটা যে কদিন থাকবে একটু কষ্ট করতেই হবে আমাদের—তারপর যুদ্ধ থেমে গেলে আবার সুদিন ফিরে আসবে। কথাটা যুক্তি দিয়ে সে জ্যোৎস্নাকে বেশ ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

অশোক মোটরের দালালী করে যা রোজগার করতো তাতে তাদের স্বামীস্ত্রীর সাহেবী পাডায় বাস করে বেশ স্টাইলের সঙ্গে চলে যেতো। কিন্তু যুদ্ধটা বাধতেই হলো বিপদ। মোটর গাড়ীর দাম যত বাড়তে লাগলো তার আয়ও তত কমতে লাগলো। কে কিনবে এত টাকা খরচ করে গাড়ী? সকলেরই পয়সার টানাটানি। অগত্যা অশোক দামী সুট ছেড়ে চাঁদনী মার্কা ধরলে; আর চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাট ছেড়ে ইলিয়ট রোডের দিকে বাসা বাঁধলে। তাও একরকম চলছিল কিন্তু সরকার যেদিন থেকে পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ করলে সেইদিন থেকে অশোক একেবারে মাথায় হাত দিয়ে পড়লো। মোটরগাড়ী বিক্রী একদম বন্ধ হয়ে গেল। তখন স্ত্রীর গহনা ও সৌখীন জিনিষ-পত্র যা ছিল ঘরে, একে একে

বিক্রি করে দিনাতিপাত করতে লাগল। এসব কথাই জ্যোৎস্না জানত, অশোক কোন কথাই তাকে গোপন করে না। তবুও সে চিন্তা করতে লাগল, আজকের দিনটীর স্মৃতি কোন রকমে রক্ষা করা যায় কিনা। কত রকমের কত কথা তার মাথায় ভীড় করে আসে কিন্তু মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে অথচ কার্য্য সুসম্পন্ন হয় এমন কিছুই সে ভেবে পায় না।

এরই মধ্যে হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় গত বৎসরের কথা। এই দিনে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে টেবিলে বসে খেতে খেতে একজন অশোককে আবেগভরা কণ্ঠে বলে উঠেছিল, বেশ আনন্দে আছিস্ কিন্তু ভাই তোরা দুজনে। অশোক তার জবাবে বলেছিল, ইচ্ছে করলে তুই এর চেয়েও বেশী আনন্দে থাকতে পারিস্! লোকটী ছিল কৃপণ-প্রকৃতির জন্য বিখ্যাত। তবু সে জিগ্যেস করলে কি করে? অশোক বললে, জীবনটাকে যদি সর্ব্বদা একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক বলে মনে না করিস্। সে কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠেছিল। আর সেদিন সবচেয়ে বেশী হেসেছিল জ্যোৎস্না নিজে।

এখন ঘুরে ফিরে কেবলি জ্যোৎস্নার সেই কথাটি মনে পড়তে লাগল। যদি কিছু তারা সঞ্চয় করে রাখতো তাহ'লে হয়ত আজ ঠিক এইখানে এই অবস্থায় এসে পৌছতে হোতো না। এই সব ভাবতে ভাবতে আবার জ্যোৎস্নার মনে পড়ে যায় অশোকের সেই কথাটা—পয়সা ত হাতের ময়লা, আজ আছে কাল নেই, কিন্তু এদিন একবার গেলে আর ফিরে আসবে না। বাস্তবিক অশোকের কথাই খাঁটী। জ্যোৎস্না ভাবলে, না—যেমন করে হোক আজকের দিনের মর্য্যাদা সে রাখবেই! সে ঠিক করলে যা পয়সা তার কাছে আছে তাই দিয়ে সে আজকের দিনের

অনুষ্ঠান আগে সম্পন্ন করবে। কালকের কথা কাল ভাববে—আর সংসার চলবে কি করে সে কথাও পরে ভাববে। আজকের দিন সে কিছুতেই বৃথা যেতে দেবে না।

সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহে ও উত্তেজনায় জ্যোৎস্না একেবারে সোজা হয়ে উঠল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে চারটে বেজে গেছে। আর সময় নেই, বাজারে যেতে হবে ; সে তখনি ছুটলো বাথরুমে। কিন্তু গা ধুয়ে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়েই সে চমকে উঠলো। রেশমের মত দীর্ঘ ও কুঞ্চিত কেশরাশি গুচ্ছে গুচ্ছে তার কপালে, ঘাড়ে, বুকে, পিঠে কোমরে একেবারে ছড়িয়ে পড়েছে—যেমন ঘন, তেমনি কালো, আর তেমনি অজস্র। সে যেন অমাবস্যার জমাট অন্ধকার, বর্ষার সুনিবিড় মেঘপুঞ্জ ! তার ওপর জ্যোৎস্নার বয়স এই পূর্ণ চব্বিশ। যদিচ যৌবনের ধর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া—এখানে কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটেছে যেন। তাকে দেখলে মনে হয়, সে তার রূপ যত দান করেছে তার চেয়ে বেশী যেন সঞ্চয় করে রেখেছে—দেহের রেখায় রেখায়, শরীরের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। ছিপছিপে একহারা চেহারা। রঙ ফর্সা নয় তবে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মুখের মধ্যে আগে নজরে পড়ে চোখ দু'টি, যেমন উজ্জ্বল তেমনি গভীর ও ভাবময়। তাতে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ নেই আছে প্রদীপের স্নিগ্ধতা। চেহারার সঙ্গে এই চুলগুলোকে এমন সুন্দর দেখায় যে বিয়ের প্রথম বছরেই তার চুল নিয়ে অশোক এগারোটি কবিতা লিখেছিল। এখন সে কবিতা লেখেনা বটে, তবে হাঁ করে মধ্যে মধ্যে চেয়ে থাকে তার চুলের দিকে।

এই সব ভাবতে ভাবতে আরো একজনের কথা মনে পড়তে

জ্যোৎস্নার চোখ-মুখ নিমেষে যেন জ্বলে উঠলো। তাদের ফ্ল্যাটে একজন মোটা ফিরিঙ্গি মহিলা থাকেন ; তিনি একদিন তাকে চুল শুকোতে দেখে বলেছিলেন, এত বড় চুলের বোঝা না বয়ে যদি সে 'বব্' করে ফেলে তাহ'লে তাকে খুব সুন্দর দেখাবে ; উপরন্তু এই চুলগুলো বিক্রী করলে সে কিছু টাকাও পেতে পারে। জ্যোৎস্না সেদিন হেসে তাকে উত্তর দিয়েছিল, কি করবো বলো আমার স্বামী যে বড়চুল খুব পছন্দ করে, তা না হ'লে তোমাদের মত বব্ করে ফেলতুম। আজ কিন্তু আয়নার মধ্যে দিয়ে সে যতবার নিজের এই সুন্দর চুলগুলির দিকে তাকাতে লাগল ততবারই মনে পড়তে লাগল সেই ফিরিঙ্গী মহিলাটীর কথা। অবশেষে জ্যোৎস্না আর স্থির থাকতে পারলে না। অন্য সব চিন্তা তখন তার মাথার মধ্যে থেকে যেন কোথায় পালালো। সে তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে ছুটলো ওপরের ফ্ল্যাটে। দরজার পাশে কলিং বেলটা টিপতেই সেই স্থূলা মহিলাটী বেরিয়ে এলেন। তারপর তাকে দেখে সাগ্রহে বলে উঠলেন, হ্যাল্লো মাই ডিয়ার গার্ল, বলো আমি তোমার কি করতে পারি ?

জ্যোৎস্না বললে, আমার চুলটা 'বব্' করে দিতে পারবে ত ? তোমার সেদিনের কথা আমি আজও ভুলিনি।

মেমসাহেবের একটা চুলকাটার দোকান ছিল। সে মেয়েদের মাথার চুল বিক্রী করতো। এই কথা শুনে তাই সে সাগ্রহে বলে উঠলো নিশ্চয়—নিশ্চয়—এখুনি পারি। চলো আমার সঙ্গে দোকানে ; এইতো গলির মোড়ে দোকান। একটু ইতস্তত: করে জ্যোৎস্না বললে, কিন্তু এর জন্যে দাম দেবে বলেছিলে একদিন—তা কত দেবে ? মেমসাহেব তার চুলগুলো একবার হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে বললে. দশ টাকা।

জ্যোৎস্না মুহূর্ত্ত কয়েক চুপ করে কি ভাবলে। তারপর বললে, আচ্ছা চলো। মেমসাহেব তখুনি তাকে নিয়ে চলে গেল।

টাকা নিয়ে জ্যোৎস্না একেবারে একটা ঘড়ির দোকানে গিয়ে উঠলো। অশোকের একটা হাতঘড়ি ছিল। সোনার ছোট্ট ঘড়ি। ভারী সুন্দর দেখতে কিন্তু তার 'ব্যাণ্ডটা' জ্যোৎস্নার একেবারে পছন্দ হতো না। সেই ঘড়ির সঙ্গে চামড়ার 'ব্যাণ্ড' যেন মোটেই মানাতো না। তাই দোকান থেকে বেছে বেছে একটা অতি সুন্দর হাল ফ্যাসানের 'ক্রোমিয়ামে'র ব্যাণ্ড সে কিনলো। দোকানদারকে জ্যোৎস্না জিগ্যেস করলে, এর চেয়ে ভাল কিছু আছে ?

না 'ক্রোমিয়ামের' এর চেয়ে সুন্দর কিছু হয় না—অবিশ্যি সোনার পেতে পারেন।

থাক্, সোনার চাই না। বলে জ্যোৎস্না দোকান থেকে বেরিয়ে এলো। এই ঘড়িটা অশোকের পৈতৃক সম্পত্তি। অশোক ম্যাট্রিকুলেসন পাশ ক'রে তার বাবার কাছ থেকে উপহার পায়। ঘড়িটি অশোকের ছিল ভারী প্রিয়। শত অভাব-অনাটনের মধ্যে পড়েও এটীকে হাতছাড়া করবার চিন্তা করতে পর্য্যন্ত সে ব্যথা পেতো। পিতৃস্নেহের এই শেষ চিহ্নটুকুর জন্যে তার মনের কোণে কোথায় যেন একটা গভীর শ্রদ্ধা লুকানো ছিল। জ্যোৎস্না এ কথা জানতো। তাই ব্যাণ্ডটা পেয়ে অশোক কি রকম খুসী হয়ে উঠবে, সে কথা চিন্তা করতে করতে সে যখন বাড়ী ফিরে এলো তখন ছটা বাজে।

বাজার থেকে আসবার পথে জ্যোৎস্না কিছু ফুল ও খাবার কিনে আনতে ভোলেনি। ঘরদোর সাজিয়ে গুছিয়ে সে রান্নাঘরে গেল।

তারপর অশোক খেতে ভালবাসে এমন কতকগুলো বাছা বাছা রান্নার কথা সে চিন্তা করতে লাগল। অশোককে সে আজ তাক লাগিয়ে দেবে। আর এই অপ্রত্যাশিত আনন্দে তার চোখ মুখ কি রকম উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে—তার ছবি কল্পনা করতে করতে জ্যোৎস্না রাঁধতে লাগল। আনন্দ সে আজ চেপে রাখতে পারছিল না। একবার তার মনে হলো, হয়ত অশোকের মনেই নেই আজকের তারিখটার কথা। জ্যোৎস্না ভাবে, বেশ হয় তাহ'লে। স্বামীর ওপর ভালবাসার এই গৌরবটুকু নেবে সে একা। সে যে অশোককে তার চেয়েও বেশী ভালবাসে সেই কথাটা মুখে না বলে কাজে দেখিয়ে দেবে। কতক্ষণে আটটা বাজবে, অশোক বাড়ীতে ফিরবে—সেই আশায় সে সিঁড়িতে কান পেতে রইল। স্বামীর পায়ের শব্দ সে দূর থেকেও বুঝতে পারে।

বেচারী অশোক! যতই তার অভাব থাক এই দিনটির স্মৃতি কখনো কি ভুলতে পারে! এই দিনটীতে যে সে পেয়েছিল জ্যোৎস্নাকে। তার বিশ্বাস এ রকম স্ত্রী পাওয়া বহু সৌভাগ্যের কথা! রূপে গুণে, সেবায় যত্নে, হাস্যে লাস্যে এ রকমটী আর হয় না। অশোকের মনে পড়ে স্ত্রীকে দেখে বাসর ঘরে সে এই গানটী গেয়েছিল—'আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো'।—আর ফুলশয্যার রাত্রে তাই নিয়ে তাদের স্বামী-স্ত্রীতে কত উচ্ছ্বাস, কত ভাবপ্রবণতা! জ্যোৎস্না সলজ্জকণ্ঠে তাকে জিগ্যেস করেছিল, তুমি ও গান গাইলে কেন? অশোক বলেছিল, ওই একমাত্র গান আমি তোমাকে শোনাবো বলে শিখেছিলুম।

নবজীবনের প্রাতে

ভাবজড়িতকণ্ঠে জ্যোৎস্না বলেছিল, যাঃ মিছে কথা—

তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি—এর চেয়ে সত্য কথা আমি আর কোন দিন বলিনি।

—তুমি কি করে জানলে 'তোমার পরাণ যাহা চায় আমি তাই গো'। স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ লুকোতে লুকোতে জ্যোৎস্না জিগ্যেস করেছিল।

—শুধু তোমাকে চোখে দেখে।

—চোখ দিয়ে যাকে দেখছো, মন দিয়ে যদি তাকে না পাও তা হলে কি গান গাইবে বলো না গো? এই কথা শুনে সেদিন দু'জনেই হো হো করে হেসে উঠেছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—সে গান এখনো পর্য্যন্ত গাইতে হয়নি। বরং শত অভাবের মধ্যেও তার মুখ দিয়ে সেই গানটিই বেরিয়েছে—'আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো'। আজ তাই সেই সব কথা স্মরণ করে অশোক সমস্ত দিন ভেবেছে কি করবে? আজকের দিনটার মর্য্যাদা কেমন করে রাখবো? টাকা ধার পাবার আর কোন স্থান নাই তার। যাহা ছিল তাদের প্রত্যেকের কাছে সুযোগ নিতে সে ছাড়ে নি। তাই জ্যোৎস্নার মত অশোকও ভাবছিল যদি জ্যোৎস্না আজকের কথাটা ভুলে গিয়ে থাকে তো ভালই হয়। দারিদ্র্যের কাছে জগতের আরো কত লোক এমনি করে প্রত্যহ বলিদান দিচ্ছে তাদের কত কল্পনা, কত আনন্দ বিলাস্! এমনি নানা চিন্তা করতে করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। অশোক ভাবতে লাগল এখনি বাড়ী যাবে, না দেরী করবে। তাড়াতাড়ি গেলে হয়ত আজকের দিনের ব্যর্থতা আরও বেশী করে তার মনকে পীড়া দেবে!

তাই সে 'ইডেন গার্ডেনের' একটা বেঞ্চিতে গিয়ে চুপ করে বসে পড়লো। অনেক্ষণ সে বসে রইল—কি যে ভাবতে লাগল তা সেই জানে। তারপর হঠাৎ একবার সময় দেখবার জন্মে হাতের ঘড়ির দিকে চেয়েই অশোক চমকে উঠলো! এইত তার ঘড়ি রয়েছে; তবে আজকের দিন—তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন বৃথা যাবে কেন? সে তখনি ছুটলো একটা ঘড়ির দোকানে। সেখানে সে ঘড়িটা বিক্রী করে ফেললে। কিন্তু এইবার অশোক আর এক সমস্থায় পড়লো কি কিনবে এই সামান্ত টাকায়? সিকি দামে ঘড়িটা বেচতে হয়েছে। ভাবতে ভাবতে সহসা অশোকের চোখের সামনে ভেসে উঠলো, জ্যোৎ-স্নার মাথার নিবিড় চুল—কালো অন্ধকারের মত চুল! সে তখন নিউ মার্কেটে গিয়ে একটা গহনার দোকানে ঢুকলো এবং অনেক বেছে দুটো হেয়ার পিন্ কিনলে। অশোক কল্পনায় দেখলে জ্যোৎস্নার চুলের মধ্যে সে দুটি ভারী স্থন্দর মানিয়েছে। তার মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট মুক্তা ও চুনি-পান্নার কাজ করা ছিল। হাতে করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে বার বার দেখতে লাগল। তারপর একটা স্থন্দর ভেলভেটের বাক্সে সেগুলোকে পুরে নিয়ে অশোক বাড়ী চললো। আজ জ্যোৎস্নাকে গিয়ে সে চমক লাগিয়ে দেবে। আর যদি আজকের তারিখের কথা সে ভুলে গিয়ে থাকে, তাহ'লে অশোক যে তাকে কত বেশী ভালবাসে সে কথাটা কি ভাষায় বলবে তাই ভাবতে ভাবতে সে বাড়ীর দরজায় এসে পৌছলো।

পা টিপে টিপে অশোক সিঁড়িতে উঠতে লাগল। জ্যোৎস্না তখন ফুল দিয়ে তাদের বিবাহের ফটোটি সাজাচ্ছিল। দরজার দিকে পিছন ফিরে ছিল বলে সে বুঝতেই পারেনি কখন অশোক ঘরে ঢুকেছে

চুপিচুপি। বলা বাহুল্য সাজানো ঘর দেখেই অশোক বুঝতে পারলে ব্যাপারটা। তাই অন্ততঃ তার দাবিটা আগে প্রতিষ্ঠা করবার জন্মে সে নিঃশব্দে জ্যোৎস্নার মাথায় সেই চিরুণীটা পরিয়ে দিতে গেল। কিন্তু যেমন সে পিছন দিক থেকে তার মাথার কাপড়টা টানলে অমনি 'বব্' করা চুল বেরিয়ে পড়লো। অশোকের মুখ নিমেষে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। সে শুধু অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো, এ কি!

জ্যোৎস্না জানতো অশোক তার মাথার চুল কত ভালবাসে। তাই আড়চোখে একবার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে সে খিল খিল করে ছেলেমানুষের মত হেসে উঠে বললে, দেখ কেমন 'বব্' করেছি, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে, না? জ্যোৎস্না ভেবেছিল হয়ত তার হাসি মুখ দেখে অশোকের মুখেও হাসি ফুটে উঠবে কিন্তু তাকে আরো গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে সে তখন অশোকের বাঁ হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে সেই 'ব্যাণ্ডটা' বেঁধে দিতে গেল। তখন ঘড়িটা না দেখতে পেয়ে সেও চমকে উঠে বললে—একি! ঘড়ি কৈ! অশোক এতক্ষণ মৌন ছিল এইবার ঘাড় হেঁট করে বললে, ঘড়িটা পুরনো হয়ে গিয়েছিল বলে বেচে ফেললুম।

একথা শুনে জ্যোৎস্নাও চুপ করে গেল।

এইভাবে আরও কিছুক্ষণ দুইজনেই নীরব হয়ে থাকবার পর জ্যোৎস্না আবার বললে, সত্যি করে বলো-নাগো তুমি ঘড়ি বেচলে কেন? এই বলে সে স্বামীর মুখের ওপর দুটী বড় বড় চোখ তুলে ধরলে।

অশোকও জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—সত্যি করে তুমি বলো চুল কাটলে কেন?

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে জ্যোৎস্না বললে, আমি মাথার চুল বিক্রী করে তোমার জন্যে এই ব্যাণ্ডটা কিনেছি।

অশোকও ধীরে ধীরে বললে, আমি ঘড়িটা বিক্রী করে তোমার জন্যে এই 'পিন্' দুটো কিনে এনেছি। *

প্রিয়তমের চিঠি

বিবাহের অভিনব অঞ্জন সবে লেগেছে নবদম্পতীর দেহে মনে। বিয়ের বড় পর্ব্ব অর্থাৎ বৌভাত সারা হয়ে গেছে কিন্তু আত্মীয় পরিজনে বাড়ি তখনও সরগরম। সারাটা দিন এই অদর্শন বড়ই দুঃসহ। তাই তারা যুক্তি করে চিঠি লেখার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। অবসর পেলেই খানিকটা চিঠি লেখে আর যথাস্থানে রেখে দেয়। সুযোগ পেলেই খোঁজ করে, উত্তরটা এসে জমা হল নাকি—অনেকক্ষণ ত হয়ে গেছে। তাদের ডাকবাক্স এবং পোষ্ট অফিস বৃদ্ধা ঠাকুরমার ঘরের একটি নির্দ্দিষ্ট কোণের খোপ। নাতি আর নাতবৌয়ের এই অভিনব প্রণয়লীলা বুড়িকে বহু

* বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

যুগের ওপারে নিয়ে যায়। এদের ঘন ঘন এ ঘরে আসা-যাওয়া আর সলজ্জ হাসির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি নূতন করে যৌবনের স্বপ্ন রাজ্যে টেনে নিয়ে যায় ঠাকুরমাকে। এরা আসে, নিজের কাজ গুছিয়ে ফিরে যায়, কিন্তু খাটের উপর বিছানার সাথে মিলিয়ে যাওয়া দেহটার দিকে চাইবার অবকাশ এদের নাই। প্রমিতা আসে—সটান কোণে গিয়ে ব্লাউজের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে টেনে বার করে রঙীন একখানা কাগজ, সেটা রাখে আর হাতড়ায় ওইটুকু জায়গাটা বার বার—যদি কোন কাগজপত্র না পায় ত বৃদ্ধার দিকে একবার চায়—'সে এসেছিল ?' এই তার বক্তব্য, তবে সেকথাটা আর মুখ ফুটে বলে না। বৃদ্ধা অনুমানে সমস্তটা বুঝে নিয়ে বলেন—'ওলো আসে নি, এলে কি আমি লুকিয়ে রাখব ?'

কখনও বা অতুল সটান এসে ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করে—'আমার চিঠি আছে ঠাকুমা ?' বলেই একবার নির্দ্দিষ্ট স্থানটা ভালো করে দেখে নেয়। তারপর চলে যায়, দাঁড়ায় না একটুও।

মাঝে মাঝে বৃদ্ধার কৌতূহল হয়, কী এরা লেখে এত ? তবু সেটা নিছক কৌতূহলই। কিন্তু হঠাৎ একদিন কোথায় যেন ওর ঘা লাগে।

সেদিন রাত তখনও গভীর হয় নি। বৃদ্ধা আপনার বিছানায় ছিল শুয়ে। কি যেন তার ভাবনা তার ঠিক নেই। আবোল তাবোল আপন মনের সঙ্গেই বকে চলেছে সে। হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা আমার নামটা যেন কী !···কমলা, হঁ্যা কমলাই বটে। কতদিনের পুরনো মরচে পড়া নামটা। বহুদিন হ'ল এর ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ ত ও নামে ডাকে না···ঠাকুমা সে।

নব জীবনের প্রান্তে

তারপর একে একে ধীরে ধীরে ভেসে আসে অতীত দিনের ইতিহাস হয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলি।

সেই একবার সে লিখেছিল চিঠি—কি সুন্দর চিঠি! কত যে কথা তার মধ্যে আছে। তার ভাষাটা ঠিক কমলার মনে আসছে না, বক্তব্যগুলোও স্বচ্ছ হ'য়ে নেই তবু সেই-কথা ভাবতে ভাবতে তার সৌরভে কমলা পাগল হয়ে উঠল।

সে বিছানা ছেড়ে দেওয়াল ধরে দাঁড়াল, টলতে টলতে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল, তারপর জানালাটাও। কোমরে একটা দড়িতে বাঁধা চাবির গোছা থেকে চাবি বেছে নিলে প্রদীপের আলোর সামনে তুলে ধরে। হাত-পা তার থর থর করে কাঁপে।

বাক্স খুলে একে একে কমলা কাপড় চোপড় নামাতে লাগল—এক একখানা কাপড় যেন কত কথাই কইছে।

এখানা সেই সেবারে সে দিয়েছিল কিনে সাধের সময়। কে যেন বলেছিল এখানা পরলে মানায় ভালো। আর, আর এখানা? কেন, সেই একবার পূজোর সময় দেওয়া। এমনি আরো কত কথাই এই এতটুকু বাক্সে বন্ধ বাতাসের কণায় কণায় জমে আছে। প্রদীপটা একটু উস্কে দিয়ে কমলা চেপে বসে মাটির উপর!

সব তলায় একটা ছোট্ট সাবানের বাক্স, সেকালে এই সাবানের চলন ছিল। এটার নাম শুনেছিল সে জমিদারের ছোট মেয়ে হরিপ্রিয়ার কাছ থেকে—অনেক অনুরোধের পর স্বামী এনে দিয়েছিলেন এই এক বাক্স সাবান। বাক্সটার ওপরকার ডালাটার কোণগুলো খুলে গেছে, সেই ডালাটা তুলে কমলা কতকগুলো কাগজপত্র বার করে।

নব জীবনের প্রান্তে

চোখে আজকাল আর সে ভালো দেখ্‌তে পায় না, চশমা দিয়েও না—তায় আবার রাত্রিবেলা। এটা ওটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেকটা সময় কেটে গেল। নজরে না সুঝলেও প্রতি পত্রের ছত্রগুলো যেন তার কণ্ঠস্থ, আন্দাজে আব্‌ছা আব্‌ছা অক্ষরগুলো ধরে সে পড়ে ফেলে সেখানা।

কিন্তু—সেই চিঠিখানা কোথায় গেল!…অসামান্য কিছুই নয়, নিতান্ত সাধারণ একটি দম্পতীর যৌবন কালের প্রণয়পত্র, তার মধ্যে এমন আর কি থাকতে পারে—অবৈধ প্রেম হ'লেও বা কথা ছিল।

সেই বিশেষ পত্রখানি কমলা অনেক কষ্টে খুঁজে বার করলে। ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে কাগজখানার গায়ে ঢেঁড়সের গায়ের কত রেঁায়া উঠে খস্‌খসে হ'য়ে গেছে। হাতের ঘামে আর তেলে তার উপর চটা হ'য়ে ময়লা জমেছে। কিন্তু কমলা সেই বিবর্ণ মলিন চিঠিখানি পেয়েই যেন হাতে স্বর্গ পেল। তার বুকের মধ্যে দোলা লাগে, মলিন পত্রখানি সে বুকের মধ্যে চেপে ধরে।—শুক্‌নো হাড়-পাঁজরা-ময় বুকে। পরক্ষণেই অনাস্বাদিত আনন্দের অনুভূতিতে থর থর আবেগে কম্পিত হস্তে মুখের উপর সেখানা চেপে ধরে সে—কতদিনের পরিচিত একটা গন্ধ! আঃ। আরামের নিশ্বাস ফেলে বাঁচে কমলা।

চিঠি। তার চিঠি। সে লিখেছিল—কমলাকেই লিখেছিল সে।

কমলার বেশ মনে পড়ে—সেই সেকালের এক নির্জ্জন রঙিন দুপুরে কমলা অপেক্ষা করেছিল সেদিন কখন ডাক পিওন আসবে—যেমন যৌবন কালে তরুণীরা করে থাকে অপেক্ষা দয়িতের সংবাদের জন্য তেমনি। দু'দিন হ'ল তার চিঠি আসার তারিখ পেরিয়ে গেছে, আজ নিশ্চয় আসবে।

নব জীবনের প্রান্তে

পিওন এসে ডাকল—দিদিমণি! গাঁয়ের পিওন রমানাথ, সেবারে বেচারী ভুগে ভুগে মারা গেছে—আহা!

এই চিঠি এলো। এটা ভালো লাগে বেশি করে, কারণ এটার মধ্যে তার দেহের যেন চিহ্ন আছে। কমলা জানে যে চিঠিখানা লিখে সে রেখেছিল বুক পকেটে, গরমের ঘামে অনেকগুলো অক্ষর মুছে গিয়েছিল। তার এই গন্ধটা, তার গায়ের ঘামের গন্ধ যে। কাগজখানা কমলা দেহের উপর একবার বুলিয়ে আবার চোখের সামনে তুলে ধরল।

কতক্ষণ যে এমনি আচ্ছন্নভাবে কেটেছিল কমলার খেয়াল ছিল না। তার সম্বিত ফিরল যখন হঠাৎ দরজায় ঘা পড়ল। ধাক্কার শব্দে প্রদীপের শিখাটা কেঁপে যায়! কমলা তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র সামলে উঠে পড়ল।

কমলার দুয়ার খুলতে একটু দেরি হয়। প্রমিতা ঢুকে জিজ্ঞাসা করে, কী করছিলেন, ঠাকুমা—এতক্ষণ ধরে দরজা বন্ধ করে?

ঠাকুমা?—হ্যাঁ ঠাকুমাই ত সে। সে বলে হেসে, 'এই তোর অমুকের চিঠি পড়ছিলুম ভাই,—'

বলে সে বিছানায় আশ্রয় নেয়।...জানলার পাশে সরষের তেলের পিদিমটা মিটমিট করে জ্বলছে। সমস্ত ঘরটা আলো-ছায়ায় মেশানো রহস্যলোকের মতই আচ্ছন্ন। কতকালের এই ঘরখানা, এর কড়ি বরগায় প্রাচীন কালের ছাপ, আলকাতরা দেওয়া মোটা মোটা কাঠের কড়িগুলোর উপর পুরু হয়ে সিঁদুর দিয়ে মাঙ্গলিক লিপি চর্চ্চিত। আগেকারকালের অনুষ্ঠানলিপি এখনও এর বুকে লেখা আছে। এত বড় ঘরে মাত্র দুটি জানালা, তার একটি বারোমাস বন্ধই থাকে কারণ

কমলার হাঁপানীটা বারোমেসে, আর জানালাটা মাথার গোড়ায়। ওপাশে স্তূপীকৃত পুরাতন পঞ্জিকা স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। প্রাচীন হাতে লেখা পুঁথিগুলি কাপড়ের মোড়কে ময়লা ধরেছে, বইয়ের পাতাগুলো লাল হ'য়ে গেছে ধুলোয়, অযত্নে। কতদিন হ'ল এগুলোর দিকে কেউ নজর দেয় না। কিন্তু কমলার চোখের সামনে অকস্মাৎ এই অতি কদর্য্য ঘরটা কুসুম গন্ধে সুরভিত হ'য়ে উঠল।

এই ঘরেই তাদের ফুলশয্যা হয়েছিল। ওই যেখানটায় পিলসুজটার তেলে মাটি তেলচিটে হ'য়ে গেছে ওখানেই ছিল তার মাথার বালিশটা। তারপর কমলার মন চলে গেল আরও, আরও গভীরে।··· এ কী পুলক শিহরণ তার মনে, তার কুঞ্চিত লোলচর্ম্মে ?

কে যেন ঘরে ঢুকল।

অতুল এসেছিল, কাজ সেরে চলে গেল।

কমলা ভাবে, অনবরত এরা চিঠি লেখে দু'জনে···আচ্ছা এরা কি লেখে এত ? নবযুগের ধারা কি সেই পুরাতন আদিকালের পথ বেয়ে চলে, না নতুন কোন পন্থা এদের আছে প্রণয় পদ্ধতির।

কতকাল আগেকার কথা, তারা লিখত চিঠি যখন দু'জনে দূরে থাকৃত, কাছাকাছি থেকে নয়। কিন্তু এরা—এরা সাম্প্রতিকের প্রতীক, এদের প্রেমোন্মেষের চেহারায় কি জোগালো মহাকাল,—কোন্ নতুন অস্ত্র, যার পরিচয় অতীত কালের পুরাতনেরা পায়নি হয়ত।

এ যুগে জন্মালেই বোধ হয় ছিল ভালো।···কি লেখে এরা এত ? একবার দেখ্‌লে কেমন হয়, এদের ধারা ! কমলা হয়ত কল্পনাও করতে পারে না—এমন সব কথা এরা লেখে। অথবা নেহাতই সাধারণ কথা ?

নব জীবনের প্রান্তে

···কমলার কৌতূহল অদম্য হ'য়ে উঠ্‌ল আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে এসে অতুলের রেখে যাওয়া চিঠিখানা মুঠোয় পুরে সে সটান বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। চিঠিখানা বালিশের তলায় লবঙ্গ আর তালমিছরি যেখানে থাকে সেখানে লুকিয়ে রাখে। কাল দিনের আলোয় চশমা দিয়ে ভালো করে পড়ে দেখবে সে।

এইটুকু ওঠানামাতে যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছিল, শুয়ে শুয়ে কাসিটা বাড়ল। হাঁপানীর টানের জোর এতই হতে লাগল যে, কমলা দুহাত দিয়ে বুক চেপে মুখ গুঁজড়ে গোঁ গোঁ করতে থাকে।

প্রমিতা আপনার কাজে এসেছিল। চিঠি না পেয়ে একটু হতাশ হল। সে যে অতুলকে এঘরে আসতে দেখেছে, অথচ চিঠি নেই? বেরিয়ে যাবার সময় একবার ঠাকুমার কাছে এলো। তাকে দেখে কমলার কাসি যেন আরও বেড়ে যায়। কিন্তু তারই এক ফাঁকে কমলা বলে 'আমি কি তোর চিঠি লুকিয়েছি মনে করছিস। এত অবিশ্বাস—যা সরে যা। আমার অত দায় পড়ে নি। আমি বলে দম বন্ধ হয়ে মরে যাচ্ছি, ওঁর ·' আর কিছু শোনা যায় না, কাসির শব্দে চাপা পড়ে।

প্রমিতা লজ্জিতভাবে চুপ করে থাকে।

এই ঠাকুমাটিকে তার ভালই লাগে, অথচ সারাদিন নানা কাজের ফাঁকে এদিকে মনোযোগ দেবার অবসর যদি-বা সামান্য থাকে, তা তখন সবাই যেন নতূন বৌকে চোখের আড়াল করতে চায় না। আহা একলাটি এই বুড়ো বয়সে এর কি কষ্ট! একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে প্রমিতার বুকের ভেতর থেকে।

নব জীবনের প্রান্তে

নাঃ সে কিছুতেই বুড়ো হবে না,—তার আগেই মরে যাবে, যেমন করেই হোক সে মরবে তার আগে।

পরদিন ঠাকুমার হাঁপানি খুবই বাড়ল। প্রমিতার উপর আদেশ হল—'বুড়িকে মাঝে মাঝে দেখো বৌমা।'

প্রমিতা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে যেন। অতুল আসে এ ঘরে ঘন ঘন। এদিকটায় বড় কেউ মাড়ায় না। প্রমিতা বৃদ্ধাকে যত দেখে তার চেয়ে বেশি দেখে আপনার নববিকশিত যৌবন-মদিরামাখা দেহ আর মনকে। অতুলের কাছে তার অভিনন্দন আপনাকে সার্থক করে তুলেছে,—এ যেন কিসের একটা অব্যক্ত মধুর অনুরণন।...

ওপাশ থেকে আবার বৃদ্ধা কেসে ওঠে, কী দীর্ঘকাল চলে একটানা ঘরর ঘরর হাঁপানির শব্দ! থেকে থেকে প্রমিতার গা ছম্ ছম্ ক'রে ওঠে, ভয়ে সে শিউরে ওঠে—এর চেয়ে বোধহয় মরণও ভালো। দুঃখ হয় বৃদ্ধার জন্য।

স্বার্থপর জাত মানুষ। বিবাহের পর দিনের বেলায় আলাপ করবার মত একটা নিভৃত কক্ষ পেয়ে প্রমিতার মনে হয়,—কোথায় যেন কণ্টক র'য়ে গেছে।—এই বুড়ি যদি না থাকত তবে হয়ত নিরবচ্ছিন্নতার সুযোগ পেত তারা। কথাটা মনে হতেই মনকে সে শাসন করে দেয়।...

এইসময়ে ওপাশ থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে বৃদ্ধা ডাকে—'দিদি, ওদিদি, আমায় একটু বাতাস কর না ভাই!'

একটু চুপ করে থেকে আবার বিক্ষুব্ধ ক্ষীণ স্বরে যেন কেঁদে কেঁদে বলে—'কই, কইরে···নেই বুঝি কেউ। আমাকে একলা ফেলে রেখে

সবাই পালিয়েছে! 'পালিয়েছে সব—এরা আমাকে মেরে ফেল্‌বে ঠিক ক'রেছে। উঃ, গেলাম, মাগো—'

এমন সময় অতুল ঢোকে ঘরে। ঠাকুমার শেষের কথাটা কানে যেতেই সে রসিকতা ক'রে বলে, 'তোমার প্রাণ কি অত সহজে বেরোবে বড়গিন্নী? আমাদের আর এ কাঠামোয় ফলার খাওয়া হবে না।'

কমলা একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকায়! অতুলের চোখে মুখে কৌতুকের জোয়ার; কমলা আর তাকাতে পারে না। মৃত্যু-পথযাত্রীকে এর চেয়ে আর কি বলে মানুষ ব্যথা দিতে পারে? কমলা আবার মুখ ফিরিয়ে নিল। এবারে কাস্‌তে কাস্‌তে দম বন্ধ হ'য়ে গেল বুঝি। প্রমিতা ছুটে আসে। তার পুষ্ট, সুগৌর হাতটা আপনার শীর্ণ কঙ্কাল-সার হাতে মুঠো ক'রে ধরে কমলা আপনার পাঁজরা বেরুনো বুকের মধ্যে চেপে ধরল।...

এ যাত্রায় আর বাঁচবার আশা নেই।

সাতটা দিন কোনরকমে কাটল টাল-মাটল করে। কিন্তু আট দিনের দিন বৃদ্ধার শেষ-নিঃশ্বাসটুকু ফুরিয়ে গেল।

নতুন যুগের নবদম্পতীর প্রণয়লিপি তার আর দেখা হ'য়ে উঠল না।

সেদিন সকালে তার পরিত্যক্ত বিছানাগুলো বাইরে বার ক'রে দিল প্রমিতা,—এ ঘরটা পরিষ্কার করা দরকার।

হঠাৎ একটা তোষকের ভাঁজ থেকে একটা ভারি কি যেন পড়ল। প্রমিতা কুড়িয়ে নিল—চশমার খাপ, তার মধ্যে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা চশমা, গোটা কয় মরচে পড়া ছুঁচ; আর একটা মোড়কে হয়ত মিছরি

আছে। প্রমিতার নজরে পড়ল একটা ময়লা তেলচিটে কাগজ। সে তাড়াতাড়ি তুলে নিল। এই কাগজটার সঙ্গে আর একটা টাট্‌কা রঙীন কাগজও পাওয়া গেল। সেখানা দেখেই সে চিন্‌ল, অতুলের হাতের ডাগর ডাগর মুক্তোর মত ঝক্‌ঝকে লেখা। ময়লা কাগজটা অজ্ঞাতেই তার হাত থেকে পড়ে গেল। অতুলের চিঠিখানা পড়ল খুলে, তার পর সেখানা ব্লাউসের মধ্যে পুরে আবার কাজ করতে লাগল। একবার মনে হ'ল—এটা এখানে এলো কেমন করে?

তারপর সে ঝাঁট দিয়ে ঘরের সমস্ত জঞ্জাল পরিষ্কার ক'রে ফেল্‌ল।

এক ফাঁকে অতুল এসে বলে গেল,—'গিন্নি, অত কাজ ক'র না।'

প্রমিতা ঝাঁটাটা নেড়ে বলে—'কাজের সময় ইয়ার্কি ভালো নয়।'

ঝাঁটার ডগায় প'ড়ে সেই তেলচিটে কাগজখানা একবার আট্‌কে গেল, তারপর আবার টান দিতেই সেখানা গিয়ে পড়ল বাইরে,—বৃদ্ধার সেই শেষ চিহ্নটুকু।

তিলোত্তমা

এক

সকলেরই জীবনে মাঝে মাঝে এমন একটি নাটকীয় মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সমস্ত হিসাব, সমস্ত আয়োজন হঠাৎ নিমেষে বদ্‌লাইয়া যায়। উত্তরবাহিনী নদীস্রোত সহসা দক্ষিণবাহিনী হইয়া পড়ে, তুঙ্গ

পর্ব্বত অকস্মাৎ গভীর গহ্বরে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষের জীবনেই এসব হয়। ইহার জন্য রাম বা রাবণ হইবার প্রয়োজন নাই।

নকুল নন্দী সাধারণ লোক, তাহার পুত্র গোকুলও অসাধারণ কিছু নহে। আর পাঁচজনের মত সে-ও বি-এ পাশ করিয়া এখানে ওখানে আড্ডা দিয়া, তাস খেলিয়া, শখের থিয়েটারে অভিনয় করিয়া, রাজনীতি অথবা সাহিত্য সম্পর্কে মাথা ঘামাইয়া অর্থাৎ এক কথায় ভ্যারেণ্ডা ভাজিয়া দিন যাপন করিতেছিল। আর পাঁচজনের যেমন বিবাহের সম্বন্ধ আসে, গোকুলেরও তেমনি আসিতে লাগিল। বিবাহের বাজারে গোকুল সুপাত্র। শহরের উপর একখানি ত্রিতল বাড়ি, পিতার তেজারতি-ব্যবসায়, মাতুলালয়ের বিষয়-সম্পত্তি যাহা আছে, তাহাতে কোন কালে গোকুলকে উদরান্নের জন্য চাকরির উপর নির্ভর করিতে হইবে না। ভগবান তাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহাতে স্বচ্ছন্দে সে সারাজীবন শখের থিয়েটারে রিজিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া নাট্য-শিল্পের উৎকর্ষ বিধান করিতে পারে।

বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। পিতা নকুল নন্দী অভিজ্ঞ লোক। কুষ্টি, বংশ, পাত্রীর রূপ, পণের পরিমাণ সমস্ত দিক বিচার করিয়া নন্দী মহাশয় যে পাত্রীটিকে মনোনীত করিলেন, তাহার ডাকনাম তিলু, ভাল নাম তিলোত্তমা। নন্দী মহাশয় সেকেলে লোক, সুতরাং পুত্রকে না পাঠাইয়া নিজেই কন্যা দেখিতে গেলেন এবং পছন্দ করিয়া আসিলেন। নাম শুনিয়া গোকুল মুগ্ধ হইয়া গেল। মনে মনে সে যে ছবিটি আঁকিতে লাগিল, কাব্যের তিলোত্তমা তাহার কাছে কিছু নয়।

দুই

শুভদৃষ্টির সময় কিন্তু সে ঘাব্‌ড়াইয়া গেল। তিলোত্তমাই বটে! তিলের মতই কুচকুচে কালো এবং গোল। ছোট ছোট চোখে ভীরু শঙ্কিত দৃষ্টি। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, কোলাহলধ্বনি, পরিবেশনধ্বনি, নানারূপ ধ্বনির মধ্যে ইহারই পাণিপীড়ন তাহাকে করিতে হইল। উপায় নাই। কিন্তু ঘাব্‌ড়াইয়া গেল।

পিতা নকুল নন্দীও ঘাব্‌ড়াইয়া গেলেন। তিনি বেহাইটিকে যেরূপ সোজা লোক মনে করিয়াছিলেন, দেখিলেন, আসলে তিনি মোটেই সেরূপ সোজা নহেন। লোকটা হাত কচলাইয়া ক্রমাগত হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ করিয়া চলিয়াছে, অথচ একটিও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। নগদ পাঁচ শত টাকা পণ কম দিয়াছে, বলিতেছে, এখন সব জুটাইতে পারা গেল না, বাকি টাকা পরে পরিশোধ করিয়া দিব। দানপত্র যাহা দিয়াছে, অত্যন্ত খেলো। চেলীর রঙ উঠিয়া যাইতেছে। রিস্টওয়াচ নাই—কলিকাতায় নাকি অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। আংটিটা সোনার কি না কে জানে—দেখিতে তো পিতলের মত। তিনি শেষে একটা ধড়িবাজের সহিতই কুটুম্বিতা করিয়া বসিলেন নাকি? তখন তিনি যাহা যাহা দাবি করিয়াছিলেন, লোকটা তাহাতেই রাজি হইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে ঘাড় নাড়িয়াছিল। দাবি অবশ্য তিনি একটু বেশিই করিয়াছিলেন, কিন্তু বেশি টাকা না পাইলে ওই কুচ্ছিৎ হাঁদামুখো মোটা মেয়েকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিয়া লইবেনই বা কেন তিনি? সব জিনিসেরই একটা হিসাব আছে তো! কিন্তু এ কি কাণ্ড? ওই অতি বিনয়ী লোকটার নিকট এ ব্যবহার

কে প্রত্যাশা করিয়াছিল ? বাড়িতেও যৎপরোনাস্তি গাল খাইতে হইল। গোকুলের মা উচ্চকণ্ঠে এই কথাই বার বার বিঘোষিত করিতে লাগিলেন যে, নকুলের 'ভীমরতি' ধরিয়াছে। তাহা না হইলে কেহ সজ্ঞানে নিজ পুত্রের জন্য ওই পেত্নীকে বউ করিয়া আনিতে পারে ? ছি ছি ছি ছি ! নকুল মিথ্যা কথা বলিয়া রেহাই পাইলেন—'ও মেয়ে আমাকে দেখায় নি। আমি যে মেয়ে দেখেছিলাম, তার টকটকে রঙ, এক পিঠ চুল, দিব্যি চোখ মুখ, গোল গোল গড়ন। চোর—চোর, জোচ্চোর, ধড়িবাজ ব্যাটা। ছেলের আমি আবার বিয়ে দেব।' সকলেই ইহাতে সায় দিল। এমন কি গোকুল পর্য্যন্ত।

তিন

তিলোত্তমার সহিত আলাপ হইল বইকি। একটা জিনিস গোকুল লক্ষ্য না করিয়া পারিল না, তিলু ভারি ভাল মানুষ। মুক্তোকেশী বেগুনের মত তাহার মুখখানিতে ভালমানুষি যেন মাখানো। লাজুকও খুব। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তবে তাহার সহিত আলাপ করিতে হইয়াছে। আলাপ করিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। তাহার বাবাকে সকলে মিলিয়া যে এত গালাগালি দিল, তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। সকালে সূর্য্য উঠিলে বা বর্ষাকালে বৃষ্টি নামিলে সে বিস্মিত বা বিচলিত হয় না। এ ব্যাপারেও হইল না। বিবাহ-ব্যাপারে এসব হইয়াই থাকে, ইহাতে আশ্চর্য্য বা দুঃখিত হইবার কিছু নাই।

নকুল নন্দী তাহার সম্পর্কে যে মিথ্যাভাষণ করিয়াছিলেন, ইচ্ছা করিলে সে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিত। কিন্তু সে করিল না। সসঙ্কোচে চুপ করিয়া রহিল। গোকুলকে স্বামীরূপে পাইয়া সে কৃতার্থ

হইয়া গিয়াছে, অকারণ বাদ-প্রতিবাদের প্রয়োজন কি? সে প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতেছে, সে গোকুলের অনুপযুক্ত, অনধিকারী হইয়াও সে ভাগ্যবলে সুখ-স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছে; কলহ-কোলাহল তুলিয়া এ আনন্দলোক হইতে নির্ব্বাসিত হইতে সে চায় না।

গোকুল বলিল, বাবা-মা বলছেন, আবার আমার বিয়ে দেবেন।

তিনু চুপ করিয়া রহিল।

উত্তর দিচ্ছ না যে?

বেশ তো। হিঁদুর ঘরে হয় তো অমন।

তোমার কষ্ট হবে না?

আমার? না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল; হ'লেও, তোমার যদি তাতে সুখ হয়, সে কষ্ট সহ্য করব।

গোকুলের মনে হইল, ইহা অভিমানের কথা। কিছু বলিল না।

চার

বছরখানেক কাটিয়া গেল।

তিনুর সম্বন্ধে মোহ-মুক্ত হইবার পক্ষে এক বৎসর যথেষ্ট সময়। না জানে লেখাপড়া, না জানে গান-বাজনা, না জানে হাবভাব। না আছে রূপ, না আছে গুণ। গুণের মধ্যে মহিষের মত খাটিতে পারে। কাঁড়ি কাঁড়ি বাসন মাজিয়া চলিয়াছে, রাশি রাশি কাপড় কাচিয়া চলিয়াছে। ভ্রূক্ষেপ নাই। মা তাহাকে রান্নাঘরে ঢুকিতে দেন না, সে বাহিরের কাজকর্ম্ম লইয়া থাকে এবং তাহাতে ডুবিয়া থাকে। আকাশে চাঁদ

উঠিল কি না, বকুল-বনে পাপিয়া ডাকিল কি না, এসবের খোঁজ রাখা তাহার সাধ্যাতীত।

নাট্যশিল্পী কবি-প্রকৃতি গোকুল দমিয়া গেল এবং অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিল। একটা চাকরানীর সহিত কাঁহাতক আর প্রেম করা যায়!

বাবা যদিও এখনও বেহাই-গুষ্টির উপর চটিয়া আছেন, কিন্তু দ্বিতীয় বার বিবাহের কথা তিনি আর উত্থাপন করেন নাই। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গোকুলের পক্ষেও মুখ ফুটিয়া সে প্রস্তাব করা শক্ত। এমন সময় বিধাতা একদিন মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

পাঁচ

'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় হইবে। সেলুকাস ও আন্টিগোনাস অভিনয় করিবার লোক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু পোশাক পাওয়া যাইতেছে না। গ্রীক পোশাক আনিবার জন্য গোকুল কলিকাতা যাইতেছিল। স্টেশনে টিকিট করিতে গিয়া তাহার চোখে পড়িল, একজন বিধবা প্রৌঢ়া ভিড়ের মধ্যে বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। নিজের পুঁটুলি ও কাপড়-চোপড় সামলাইয়া তিনি কিছুতেই টিকিট করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। লোকে চতুর্দ্দিক হইতে ধাক্কাধাক্কি করিয়া তাঁহাকে কেবল পিছাইয়া দিতেছে। গোকুল তাঁহাকে সাহায্য করিল। টিকিট কিনিয়া দিল। তিনিও কলিকাতা যাইতেছেন, তাঁহার সহিত কোনও পুরুষ অভিভাবক নাই, সুতরাং গোকুলকে সে ভারও লইতে হইল। গোকুলের কামরাতেই তিনি উঠিলেন। গোকুল নিজের নানারূপ অসুবিধা করিয়া, এমন কি একজন প্যাসেঞ্জারের সহিত কলহ করিয়াও তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিল।

প্রৌঢ়া মুগ্ধ হইলেন।

কামরা ক্রমশ খালি হইয়া গেলে প্রৌঢ়া পুঁটুলি হইতে পান বাহির করিয়া গোকুলকে একটি দিলেন, নিজেও একটি লইলেন। তাহার পর চক্‌চকে একটি রূপার কৌটা হইতে খানিকটা জরদাও বাহির করিলেন। গোকুল লইল না, অভ্যাস ছিল না। প্রৌঢ়া স্মিতমুখে নিজের মুখ-বিবরে খানিকটা নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, কপাল যখন পুড়ে গেল, তখন একে একে সবই ছাড়তে হ'ল। এটুকু কিন্তু এখনও ছাড়তে পারি নি বাবা।

মুচকি হাসিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া পিচ ফেলিলেন।

আলাপ শুরু হইয়া গেল।

দীর্ঘ আলাপ হইল। দীর্ঘ আলাপের ফলে প্রৌঢ়া গোকুলের নাড়ী-নক্ষত্র সমস্ত জানিয়া লইলেন। গোকুলও মন খুলিয়া সমস্ত বলিয়া ফেলিল। কিছুই গোপন করিল না, করিতে পারিল না, এমন কি করিবার প্রয়োজনও অনুভব করিল না। অর্থাৎ গোকুলও মুগ্ধ। সব শুনিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন, তুমি যে আবার বিয়ে করব বলছ, পাত্রী ঠিক হয়েছে কোথাও ?

এখনও হয় নি।

আর এক খিলি পান এবং আর একটু জরদা মুখে দিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন, দেখ বাবা, তা হ'লে সব কথা তোমাকে খুলেই বলি। আমার একটি মেয়ে আছে, ওই মেয়েটি হবার পরই আমার কপাল পুড়ে গেল। মনের মত একটি পাত্র আমি খুঁজছি। তুমি তো আমাদের পাল্‌টি ঘর, তোমাকে ভারি পছন্দ হয়েছে আমার, আমার মেয়েও কিছু নিন্দের নয় —যদি বল, তা হ'লে—

গোকুল ইহা প্রত্যাশা করে নাই। কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

উষাকে আগে দেখ তুমি। তোমার যদি পছন্দ হয়, তা হ'লে—

আমতা আমতা করিয়া গোকুল বলিল, আমার একটি স্ত্রী বর্ত্তমান আছে, সে কথা জানবার পর আপনার মেয়ে হয়তো আপত্তি করতে পারেন।

আমার কথার ওপর কথা কইবে উষা! তেমন মেয়ে সে নয়। তাকে লেখাপড়া গান-বাজনা সবই শিখিয়েছি, কিন্তু আজকালকার মেয়েদের মত অবাধ্য তাকে হতে দিই নি। আর একটা স্ত্রী থাকলেই বা! তাছাড়া তুমি যখন আবার বিয়ে করতে যাচ্ছ, তখন সে স্ত্রীকে তুমি ত্যাগই করবে ঠিক করেছ নিশ্চয়—অ্যাঁ, কি বল?

তা তো ঠিকই।

তা হ'লে সে স্ত্রী থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি—অ্যাঁ, কি বল?

তা তো ঠিকই।

ছয়

উষা উষা নয়—দ্বিপ্রহর।

প্রখর রৌদ্র-কিরণের প্রদীপ্ত স্বর্ণকান্তি তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঝলমল করিতেছে। চোখে-মুখে চলনে-বলনে হাস্যে-কটাক্ষে বিদ্যুৎ। সেতারে অমন গৌড়সারঙের আলাপ গোকুল আর কখনও শোনে নাই, হাসির পরদায় পরদায় এমন গিটকিরি তাহার কল্পনাতীত ছিল।

গোকুল কুল হারাইল।

নবজীবনের প্রান্তে

সাত

ইহার মাসখানেকের মধ্যে প্রায় সব ঠিক হইয়া গেল। উষাকে লইয়া উষার মা চলিয়া আসিলেন এবং গোকুলদের বাড়ির নিকট একটি বাড়ি ভাড়া লইয়া গোকুলের পিতামাতার সহিত কথাবার্ত্তা চালু করিয়া দিলেন। উষাকে দেখিয়া গোকুলের মা শুধু মুগ্ধ নয়—আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। গোকুলের বাবা আত্মহারা হইলেন টাকার অঙ্ক দেখিয়া। ইহার সহিত বিবাহ ঘটাইতে পারিলে নগদ দশ হাজার টাকা, প্রচুর গহনাপত্র এবং ছোটখাট একটি জমিদারি ঘরে আসিবে। উষার মায়ের নামে একটি কলঙ্ক নাকি আছে—যাহার জন্যই নাকি তাঁহার মেয়ের বিবাহ হইতেছে না। তাহা অবগত হইয়াও নকুল নন্দী বিচলিত হইলেন না। শুধু যে সেটা উপেক্ষা করিলেন তাহা নয়, বাড়ির অপর কাহাকেও জানিতে পর্য্যন্ত দিলেন না, পাছে বিবাহটা ভাঙিয়া যায়। যৌবনকালে অমন পদস্খলন দুই-একবার সকলেরই হয়। উহা লইয়া মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নাই—ইহাই তাঁহার যুক্তি। উষা একটি শর্ত্ত করিল এবং সে শর্ত্তেও গোকুল, গোকুলের মা, বাবা সকলে রাজি হইলেন। বিবাহের পরই তিলোত্তমাকে জন্মের মত বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিতে হইবে।

আট

রাত্রি দ্বিপ্রহর।

বিনিদ্র নয়নে গোকুল একা বিছানায় জাগিয়া আছে—কাল সকালেই উষার মা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। কই, তিলোত্তমা তো এখনও আসিল না! এত কাণ্ড হইয়া গেল তিলোত্তমা একটি কথাও

বলে নাই। তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। গোকুল এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। সমস্ত কাজ সারিয়া তিলোত্তমা অনেক রাত্রে শুইতে আসে, খুব ভোরে আবার উঠিয়া যায়। তাহার দেখা পাওয়াই শক্ত। গত কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে একবারও তাহার সহিত নির্জ্জনে দেখা হয় নাই, এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হয় নাই। একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত বইকি। গোকুল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

হঠাৎ গোকুলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল, তিলোত্তমা সসঙ্কোচে উঠিয়া যাইতেছে। ভোর হইয়া গিয়াছে।

শোন, শোন।

কি ?

আজ আশীর্ব্বাদ, মনে আছে তো ?

আছে।

দেখ, তোমার আপত্তি নেই তো ?

না।

বিয়ের পরই তোমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলছে—শুনেছ সে কথা ?

শুনেছি। তাই যাব। তুমি এক-আধবার যাও যদি দয়া ক'রে, তাতেই আমার যথেষ্ট হবে। আমি যাই, আমার অনেক কাজ প'ড়ে আছে।

চলিয়া গেল।

গোকুল কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া শুইয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া বসিল। তাহার পর বিছানা হইতে নামিয়া জানালার নিকট

গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, তিলোত্তমা ছাই-গাদায় বসিয়া বাসন মাজিতেছে।

নয়

আশীর্ব্বাদের সাজ-সরঞ্জাম লইয়া উষার মা আসিলেন। প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম। প্রকাণ্ড একটা ফুলের মালাও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মুচকি হাসিয়া বলিলেন, উষা সারারাত ধরিয়া নিজের হাতে মালাটি গাঁথিয়াছে।

গোকুল স্নান করিয়া আসিল। কার্পেটের আসন পাতা হইল। মালা পরিয়া গোকুল আসনে বসিতে যাইবে, এমনসময় গোকুলের মা বলিলেন, শাঁখটা বাজায় কে, আমার ঠোঁটের ঠিক মাঝখানে একটা ব্রণ হয়েছে আবার। ও বউমা, কোথা গেলে তুমি? শাঁখটা বাজাও।

শাঁখটা হাতে লইয়া সসঙ্কোচে তিলোত্তমা দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

শাঁখটা বাজিয়া উঠিতেই গোকুলের পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎশিহরণ বহিয়া গেল। আকস্মিক বজ্রাঘাতে সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

আমাকে মাপ করবেন।

দুই হাতে মালাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল।

শেষ